চরিত্রগঠনমূলক হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী
১৮টি সত্য ঘটনার এক অনবদ্য সংকলন

যে গল্পে হৃদয় গলে

তৃতীয় খন্ড

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

যেভাবে বইটি সাজানো

যে গল্পে হৃদয় গলে

(তৃতীয় খণ্ড)

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
এম.এ. (ফার্স্ট ক্লাশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ফাযেল, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা।
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদ্‌রাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৯২১৯৩, ফোন ঃ ০৬২১-৬২৫৪১ (অনুঃ)

সম্পাদনায়
মাওলানা বশীর উদ্দীন
শাইখুল হাদীস, দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।

প্রকাশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
বাংলাবাজার, ঢাকা।

যেভাবে বইটি সাজানো

যে গল্পে হৃদয় গলে (৩য় খন্ড)

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা এম,এম
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৭২১৭১৩৬২, ৭১২৫৪৬২

প্রকাশ কাল

১ম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ২০০৩ইং
২য় প্রকাশ ঃ জুলাই ২০০৪ইং

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ

পাওয়ারম্যাক কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টিং
ফোন ঃ ৮৩৫৪৮৩৪, ০১৯ ৩৪২১৩৯

কম্পিউটার কম্পোজ

মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাইফুল্লাহ
সাবীলুল ফালাহ কম্পিউটার্স
ফোন ঃ ০১৯-৩৮০৬২৩, ৯৬৬৯০১৬

মূল্য

একশত বিশ টাকা মাত্র

অর্পণ

জীবন সঙ্গীনী
সাআ'দের আম্মুকে
যার সার্বিক সহযোগিতা
সীমাহীন ত্যাগ
ও অপরিসীম উৎসাহ- অনুপ্রেরণা
আমার চলার পথকে
সহজ করে দিয়েছে।
-লেখক

যেভাবে বইটি সাজানো

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আকাবিরে উম্মতের দীপ্ত প্রদীপ
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ উস্তাদুল আসাতিজা
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ) এর মূল্যবান

অভিমত ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুজুর্গানে দ্বীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প-কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলীতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলী।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুফীজুল ইসলাম **যে গল্পে হৃদয় গলে** নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষনীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের উসিলা বানাও। আমিন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক)

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (রাহঃ) এর সুযোগ্য খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস

হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দোয়া

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হল, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম তার **যে গল্পে হৃদয় গলে** নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয়-বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প-কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে। এবং সাথে সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

২০ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস
নরসিংদী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আলহাজ্ব হযরত
মাওলানা মুফতী আলী আহমাদ হুসাইনী সাহেবের

অভিমত ও দোয়া

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াকাফা ওয়াসালামুন আলা ইবাদি হিল্লাযি নাসত্বাফা। আম্মাবাদ,

গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষন চিরন্তন। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। গল্প-কাহিনী মানুষ শুনতে যেমন ভালবাসে তেমনি পড়তেও তাদের ভাল লাগে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী কিংবা বৃদ্ধ-জোয়ানের ভেদাভেদ নেই। গল্পের প্রতি মানুষের এ স্বভাবগত ঝোকের কারণেই তারা গল্প পড়ে, শুনে এবং শুনানোর জন্য অন্যকে অনুরোধও করে। সুতরাং গল্পের বিষয়বস্তু যদি সুন্দর, ভাল ও চরিত্রগঠনমূলক হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, সৎ-সুন্দর ও উত্তম হবেই। যা তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। **'যে গল্পে হৃদয় গলে'**র লেখক অত্যন্ত রুচিশীল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিমায় সে কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন। এ দ্বীনি খেদমতের জন্য আমি তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

চলমান খন্ডের পর আরও কয়েকটি খন্ড বের করার পরিকল্পনার কথা শুনতে পেরে সত্যিই আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ পাক তাকে এবং তার মহৎ উদ্যোগকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা জাতির হেদায়েতের পথকে উম্মুক্ত করুন। আমীন।

(মাওলানা আলী আহমদ হোসাইনী)

কেন এই প্রয়াস?

সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি সেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর জন্য, যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। অপরিসীম রহমতের ফল্গুধারা বর্ষিত হোক নবীকুল শিরমনি আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি যিনি যাবতীয় অন্যায় অবিচার, কুসংস্কার-অপসংস্কৃতি ও তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে কলম চালনাকে জিহাদ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

'যে গল্পে হৃদয় গলে' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ২০০২ সনের অক্টোবর মাসে। তখন এর দ্বিতীয় খন্ড বের করার কোন পরিকল্পনা আমার ছিল না। ইচ্ছা ছিল, পেশাগত ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বই রচনা করবো। কিন্তু প্রথম খন্ড বের হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত মোবারকবাদ ও দোয়া আমাকে এতটাই অনুপ্রাণিত করেছে যে, মাত্র ৪/৫ মাসের ব্যবধানে সম্মানিত পাঠকদের হাতে দ্বিতীয় খন্ডও তুলে দিতে বাধ্য হয়েছি। ভেবেছিলাম, এ পর্যন্তই শেষ করব। কিন্তু এবারও পাঠক-পাঠিকাদের অফুরন্ত ভালবাসা, গভীর আগ্রহ এবং খন্ড বের করার এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জোর তাগাদার কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি যে, আল্লাহ পাক তাওফীক দিলে খন্ড বের করার এই ক্রম সংখ্যা দশ পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছাব। উদ্দেশ্য হল, সীরাতে মুস্তাকীম তথা সত্যের পথে চলতে আগ্রহী কোন নিষ্ঠাবান পাঠক যেন গল্পচ্ছলে তার ঈমান-আমল, আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ এককথায় ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক ধারনা লাভ করতে পারে এবং তদানুযায়ী আমল করে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবী অর্জন করতে পারে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নিতে আমাকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে জনৈক পাঠিকার কয়েকটি মূল্যবান কথা। সে বলেছিল, "আমি একটি আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে। পর্দা করে চলাফেরা করতাম না। নিয়মিত নামায পড়তাম না। কিন্তু আপনার বইখানা গভীর মনযোগ সহকারে পড়ার পর আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। আমি মহিলা মাদরাসায় ভর্তি হলাম। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান পর্দা পালন করতে শুরু করলাম। আপনার নিকট আমার বিনীত অনুরোধ,

আপনি এ জাতীয় গল্প-কাহিনী দিয়ে আরো কয়েকটি খন্ড বের করুন। এতে হয়তো আমার মতো হাজারো ভাই-বোন সত্যের পথে, সুন্দরের পথে চলতে অনুপ্রাণিত হবে।"

দ্বিতীয় খন্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে আমি সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের খেদমতে আরজ করেছিলাম, তারা যেন অত্র বইয়ের প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খন্ড সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা, ভাল লাগা, মন্দ লাগা ও বইটির মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ অল্প কথায় লিখে আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। আলহামদুল্লিাহ। তারা এতে বেশ সাড়া দিয়েছেন। তাই আমি আমার অঙ্গীকার মোতাবেক তা তৃতীয় খন্ডের শেষ ভাগে গ্রন্থবদ্ধ করলাম। ইনশাআল্লাহ, এই ধারাবাহিকতা পরবর্তী খন্ডগুলোতেও চলতে থাকবে।

যারা মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার নিকট দু'কলম লিখে পাঠিয়েছেন এবং টেলিফোনে বা মৌখিকভাবে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সুপরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং শুকরিয়া জানাচ্ছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাকে এখলাছের সাথে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার তাওফীক দেন এবং মুহতারাম পাঠক ভাই-বোনদেরকে এ বইয়ে উল্লেখিত ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে সৎ, আদর্শ ও নিষ্ঠাবান মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করেন।

বিনয়াবনত

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ইং

মুফীজুল ইসলাম

যেভাবে বইটি সাজানো

অহংকারের সাজা..........১১
পর্দাহীনতার নগদ শাস্তি..........২৩
একটি বিস্ময়কর ঘটনা..........২৯
এমন শাসকের আজ বড় প্রয়োজন..........৩৫
পতি প্রেমের এক বিরল দৃষ্টান্ত..........৩৯
এভাবেই পরিবর্তন হোক আমার জীবন..........৪৬
একটি ভয়ংকর ঘটনা..........৫৪
ন্যায় বিচারের অনুপম দৃষ্টান্ত..........৫৯
মহিয়সী মা..........৬৬
যেমন বৃক্ষ তেমন ফল..........৭০
একটি হৃদয়বিদারক কাহিনী..........৭৯
অপূর্ব বদান্যতা..........৮৮
একটি মর্মান্তিক কাহিনী..........৯২
আরেকটি ভয়াবহ ঘটনা..........৯৪
কুখ্যাত ডাকাতের বিখ্যাত কাহিনী..........৯৭
আল্লাহর ভয়........১০০
মেহমানদারীর সুফল........১০২
ধৈর্যের পাহাড়........১০৪
পাঠকের মতামত........১০৮
একটি ঘোষণা........১১২

শিরোনামের উপর ক্লিক করুন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অহংকারের সাজা

অহংকার একটি মারাত্মক রোগ। তবে এটি দেহের কোন রোগ নয়। বরং এটি হচ্ছে আত্মার রোগ, অন্তরের ব্যাধি। মানব হৃদয়ে যতগুলো রোগের সমাবেশ ঘটে তন্মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক, ভয়ানক ও ক্ষতিকর রোগ হচ্ছে অহংকার। এ রোগ অতি দ্রুত মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে। এজন্যেই কথায় বলে, "অহংকার পতনের মূল।"

নিজকে বড় মনে করে অন্যকে তুচ্ছ ও হেয় মনে করাকেই অহংকার বলে। অহংকারের ক্ষতি এত বেশী যে, তা বলে শেষ করা যাবে না। অহংকারী ব্যক্তিকে যদিও সামনা সামনি কেউ কিছু বলে না বা বলার সাহস পায় না, কিন্তু একথা শতভাগ সত্য যে, কেউ হৃদয় দিয়ে তাকে ভালবাসে না। অন্তরের মনিকোঠায় স্থান দেয় না। বরং সকলেই তাকে অন্তর দিয়ে ঘৃনা করে এবং সুযোগে শত্রুতা করে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে।

অহংকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালাও পছন্দ করেন না। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে অহংকারের নিন্দাবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দাম্ভিক অহংকারীর অন্তরকে মোহরযুক্ত করে দেন। (সুরা গাফিরঃ ৩৫)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

হাদীসে কুদসীতে রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা ঘোষনা করেছেন,বড়ত্ব ও অহংকার আমার চাদর আর মহত্ব আমার ইযার (পোষাক বিশেষ)। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দুটির যে কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানিতে লিপ্ত হবে (অর্থাৎ বড়ত্ব ও অহংকার যা কেবল আমারই গুণ এবং যা আমার জন্যই শোভা পায় তা নিয়ে যদি অন্য কেউ মাতামাতি করে এবং অহংকার প্রদর্শন করতে থাকে) তাহলে আমি অবশ্যই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (মুসলিম)

অহংকারের আরেকটি ক্ষতিকর দিক এই যে, অহংকারী ব্যক্তি কারো নসীহত কবুল করে না। কেহ সৎ পরামর্শ দিলে তাও সে গ্রহণ করে না। বরং উল্টো নসীহতকারীকে খারাপ মনে করে এবং যা তা বলে কষ্ট দেয়। ফলে সে নসীহতের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, অহংকারের ক্ষতি, অপকারিতা ও ভয়ানক শাস্তি কেবল পরকালের সাথেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইহলৌকিক জীবনেও এজন্য নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, মানুষের ভালবাসা ও আদর-স্নেহের পরিবর্তে ঘৃনা আর অপমান কুড়াতে হয়।

শুধু তাই নয়, অহংকার নামক এই ব্যাধির কারণে কোন কোন সময় এমন নির্মম পরিণতির শিকার হতে হয় যা ভাবতে গেলেও গা শিউরে উঠে। ঝরঝর করে দু-গন্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। নিজের অজ্ঞাতসারেই হৃদয়ের গহীন কোন থেকে উথলে উঠে-'অহংকারের সাজা কি এতই নিষ্ঠুর? এতই নির্মর্ম? এতই হৃদয়বিদারক?'

আমার এ বক্তব্যের সত্যতা নিম্নোক্ত বাস্তব ঘটনা থেকেই পাঠকবৃন্দের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি।

গ্রীষ্মের দুপুর। প্রচন্ড উত্তাপ বিচ্ছুরিত করে সূর্যটা মাথার উপর দন্ডায়মান। ঘর্ম প্রবাহিত হয়ে প্রায় সকলেরই উষ্ণ দেহ প্লাবিত হচ্ছে। দেখলে মনে হবে সকলেই যেন সরোবর থেকে সন্তরণ শেষে এইমাত্র ফিরে এসেছে।

আব্দুর রহীম নামের এক বৃদ্ধ। বয়স আনুমানিক পঞ্চাশের বেশী হবে। কাজ কর্ম করে খাওয়ার মত কোন শক্তি সামর্থ নেই। এজন্য

জীবন বাঁচানোর তাগিদে শেষ অবলম্বন হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। ভিক্ষার ঝুলিই এখন তার নিত্যদিনের সঙ্গী।

আজ দু'দিন যাবত শরীর অসুস্থ থাকার কারণে ভিক্ষা করতে যেতে না পারায় তাকে শুধু পানি খেয়েই জীবন বাঁচাতে হয়েছে। আজ তিনি মোটামুটি সুস্থ। কিন্তু পেটে ক্ষুধার অনল দাউ দাউ করে জ্বলছে। দু'দিনের অসুস্থতায় শরীরটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এই দুর্বল দেহ নিয়ে গ্রীষ্মের এই খৈ ফোটা রোদে বাইরে বের হতে কিছুতেই তার মন চাইছে না। কিন্তু মন না চাইলে কি হবে, তাকে যে বের হতেই হবে। মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে দু'মুটো খাবার সংগ্রহ করে পেটে দিতে না পারলে আজকেই যেন তার জীবন প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভে যাবে। স্তব্দ হয়ে যাবে জীবনের সকল কর্ম কোলাহল। পাড়ি জমাতে হবে এমন এক জগতে যেখান থেকে কেউ কোন দিন ফিরে আসে না। তাই দু'মুটো খাবারের আশায় ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে এক পা দু'পা করে সামনে এগুতে লাগলেন তিনি।

গুলশানের অভিজাত এলাকা। জনাব রুস্তম আলী সাহেব। আলীশান প্রাসাদের নীচ তলার একটি কক্ষে সদ্য বিবাহ করা সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে খাবার খাচ্ছেন। নানাবিধ মুখরোচক সুস্বাদু খাবার তার ডাইনিং টেবিলে সজ্জিত। নানা উপাদান দিয়ে রান্নাকৃত খাবার থেকে সুঘ্রাণ বের হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে স্ত্রী জামিলার সাথে খোশগল্প করতে করতে বড় তৃপ্তির সাথেই খাবার খেয়ে চলছেন বিশাল ধন ঐশ্চর্য্যের মালিক জনাব রুস্তম আলী সাহেব।

আজ ১০ বছর হল রুস্তম আলী সাহেবের পিতা হোসেন আলী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। পিতার একমাত্র সন্তান হওয়ায় উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি পিতার রেখে যাওয়া কয়েকটি আলীশান বাড়ী, ৫টি পাজারো গাড়ী, ১০টি গার্মেন্টস ও কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন।

কথায় বলে, 'অর্থ অনর্থের মূল'। রুস্তম আলী সাহেবের বেলায় একথাটি যেন একশ ভাগ সত্যে পরিণত হয়েছে। কারণ পিতার মৃত্যুর পর একদিনে এতকিছুর মালিক হয়ে কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠলেন তিনি। দম্ভ-অহমিকা তাকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলল যে,

মানবতা ও মনুষ্যত্বের কোন কিছুই অবশিষ্ট রইল না তার কাছে। তার অহংকারের মাত্রা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল যে, মানুষকে মানুষ হিসেবে জ্ঞান করতেও যেন তার কুণ্ঠাবোধ হয়। অধীনস্থ কর্মচারীদেরকে ডাট-ধমক দেওয়া, কান ধরে উঠাবসা করানো, চড়-থাপ্পর লাগানো তার নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আগের সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও টাকা পয়সা ও সম্পদের প্রলোভন দেখিয়ে জামীলাকে দ্বিতীয় বধূ বানিয়ে ঘরে তুলতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি।

জামীলা ঘরে আসার পর তিনি প্রথম স্ত্রীর কথা যেন ভুলেই গিয়েছেন। সারাক্ষণ তিনি এখন জামিলাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তাকে নিয়েই আমোদ প্রমোদে মেতে উঠেন। তার সাথেই খাওয়া দাওয়া করেন। প্রথমা স্ত্রীর তেমন কোন খোঁজ খবরও তিনি নেন না। নেওয়ার প্রয়োজনও মনে করেন না। এজন্য প্রথমা স্ত্রী রহীমা নীরবে বসে চোখের পানি ফেলেন এবং খোদার দরবারে ফরিয়াদ করে বলেন, হে খোদা! তুমি এই জুলুমের বিচার কর। আমি কেবল তোমারই নিকট বিচার প্রার্থী।

এদিকে আব্দুর রহীম বহু কষ্ট করে জঠর জ্বালা নিবারণের জন্য দু'মুটো খাবারের আশায় জনাব রুস্তম আলীর বাসার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়লেন। আওয়াজ পেয়ে রুস্তম আলী সাহেব বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞেস করলেন কে? কি চাই?

জবাবে বৃদ্ধ বললেন, আমি একজন ভিক্ষুক। ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে আপনাদের নিকট এসেছি। দয়া করে সামান্য কিছু খাবার দিয়ে আমার জীবন রক্ষা করুন।

ভিক্ষুকের কথা শুনে রুস্তম আলী সাহেব রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, খাবার চাওয়ার আর সময় পাও না বুঝি? স্ত্রীকে নিয়ে আরাম করে একটু খানা খেতে বসেছি আর তুমি কিনা আমাদের ডিস্টার্ব করতে এসেছ। দূর হও এখান থেকে। না হয় এখনি ঘাড় ধরে বের করে দিব।

বৃদ্ধ বললেন, বাবা! আমি আজ দু'দিন যাবত না খেয়ে আছি। বড় আশা নিয়ে তোমার নিকট এসেছি। আমাকে একমুটো খাবার দিলে এখনই আমি চলে যাব।

বৃদ্ধের কথায় তার রাগ যেন আরও শতগুণে বৃদ্ধি পেল। অহংকারের বশীভূত হয়ে তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, যাবে না? দাঁড়াও এখনই তোমাকে অসময়ে বিরক্ত করার মজা বুঝিয়ে দিচ্ছি। একথা বলে রুস্তম আলী দ্রুতবেগে রুম থেকে বের হয়ে আসলেন এবং বৃদ্ধকে হাকাতে হাকাতে একটু দূরে নিয়ে ঘাড় ধরে এত জোরে একটি ধাক্কা মারলেন যে, নিজকে সামলাতে না পেরে বৃদ্ধ জমিনে লুটিয়ে পড়লেন।

বৃদ্ধ যেখানে লুটিয়ে পড়লেন তার পাশেই ছিল বড় একটি খাদ। দুদিন ধরে না খেয়ে শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়ায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েও বৃদ্ধ নিজেকে সামাল দিতে পারলেন না। ফলে তার দুর্বল দেহখানা গড়াতে গড়াতে খাদের একদম নীচে এসে পড়ল।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। আঁখি যুগল তার তপ্ত অশ্রুতে ভরে উঠে। বেদনার অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে তার নয়ন যুগল। হৃদয়টা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। তখন ভারাক্রান্ত হৃদয় থেকে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসে, হে পরওয়ার দেগার! একজন দুর্বল অসহায় বৃদ্ধের সাথে কেমন নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হল, তা তুমি ভাল করেই দেখেছ। হে খোদা! আমি মজলুম-অত্যাচারিত। আমি তোমার কাছে এই অমানবিক আচরণের বিচারপ্রার্থী। একথা বলে তিনি অবোধ বালকের ন্যায় হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর তিনি ধীরে ধীরে খাদ থেকে উপরে উঠে অন্য দিকে চলে গেলেন।

বৃদ্ধের এই করুণ অবস্থা অবলোকন করেও অহংকারী রুস্তম আলীর মনে সামান্যতম দয়ার উদ্রেক হলো না। তার পাষান হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও মায়া-মমতার চিহ্ন ফুটে উঠল না বরং মনের ঝাল মিটাতে পেরে উল্টো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। অতঃপর ঘরে প্রবেশ করে জামিলাকে লক্ষ্য করে বললেন, বৃদ্ধকে জনমের শিক্ষাটাই দিয়ে এলাম। অসময়ে এসে আর কখনোই আমাদেরকে বিরক্ত করার সাহস পাবে না। একথা বলে তিনি আবার খাওয়া শুরু করলেন।

জামিলা দরজায় দাঁড়িয়ে সবকিছুই দেখলো। পিতার বয়সী একজন বৃদ্ধের সাথে এরূপ অমানবিক আচরণে তার কুসুম হৃদয় কেঁপে উঠলো। ভাবলো, মানুষ কি মানুষের সাথে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে?

যেভাবে বইটি সাজানো

পারে কি একজন দুর্বল অসহায় ও সম্বলহীন বৃদ্ধকে কেবল খাবার চাওয়ার অপরাধে এভাবে ধাক্কা মেরে খাদে ফেলে দিতে? এ সব কথা তার কোমল হৃদয়ে বার বার ঘুরপাক খেতে থাকলেও স্বামীকে সে মুখ খুলে কিছুই বলতে পারলো না। তবে তার স্বামী যে একজন হৃদয়হীন অহংকারী কাপুরুষ তা তার কাছে খুব স্পষ্ট রূপেই প্রতিভাত হল।

অহংকারী রুস্তম আলীর খানা খাওয়া এখনও শেষ হয়নি। বৃদ্ধকে উচিত শিক্ষা দিতে পেরে তার চেহারায় যে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল তা এখনো মিলে যায়নি। এমন সময় তার সবচেয়ে বড় গার্মেন্টসের ম্যানাজার মাহবুব এসে সংবাদ দিল স্যার! আপনার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে অকস্মাৎ আগুন লেগে সবকিছু পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ১০জন নিহত হয়েছে। ৭৫জন আহত হয়েছে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। গার্মেন্টসের দুর্বল বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা থেকেই এই ভয়াবহ আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে। এজন্য গোয়েন্দা পুলিশ আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছে। যদি বাঁচতে চান তাহলে এখনই পালানোর চেষ্টা করুন। আমাকেও তারা খুঁজ করছে। তাই আমিও গা ঢাকা দিচ্ছি।

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা শুনে রুস্তম আলীর চেহারা পাংশুবর্ণ ধারণ করল। গ্রেফতারের পরওয়ানা জারী হওয়ায় সে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। মনে হল সমগ্র পৃথিবী যেন তার জন্য ছোট হয়ে এসেছে। পায়ের নীচের মাটি যেন সরে গেছে।

রুস্তম আলীর আর খাওয়া হল না। খাবারের প্লেটটা জামিলার দিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বললো, জামিলা! চললাম। জানি না, তোমার সাথে আবার কবে দেখা হবে। তাছাড়া আমি এও জানি না যে, আমার শেষ গন্তব্য কোথায়? ভাগ্য আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

জামিলা মুখে মুখে স্বামীকে সান্তনা দিল। বললো, মানব জীবনে বিপদাপদ আসাটাই স্বাভাবিক। বিপদে ধৈর্যধারণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং বিচলিত না হয়ে সাহসিকতার সাথে সামনের করণীয় ঠিক করে নিন।

এ জাতীয় আরো দু'চারটি কথা বলে জামিলা রুস্তম আলীকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু অহংকারী স্বামীর বুঝে না আসলেও তার একথা ভাল করেই বুঝে আসছিল যে, বৃদ্ধের সাথে এই

নিমর্ম আচরণই হল এই আকস্মিক বিপদের মূল কারণ। বৃদ্ধের বুকফাটা আর্তনাদ আর করুণ আহাজরী হয়তো খোদার আরশকেও কাঁপিয়ে তুলেছে। তার ফরিয়াদ আল্লাহ পাক অবশ্যই কবুল করেছেন। তাইতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মজলুমের বদদোয়া থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা তখন আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন পর্দা থাকে না।

রুস্তম আলী কাল বিলম্ব না করে ঘরে রক্ষিত কিছু টাকা হাতে নিয়ে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। ধরা পড়ার ভয়ে সে এখন দিশেহারা। শেষ পর্যন্ত অনেক চরাই উৎরাই পার হয়ে রাঙ্গামাটি জেলার দুর্গম পার্বত্য এলাকায় এক আত্মীয়ের বাসায় এসে আশ্রয় নিল। ভয় শংকা এখানেও তাকে সব সময় তাড়া করে ফিরছিল।

এদিকে নিহতদের আত্মীয় স্বজনেরা ক্ষতিপূরণ দাবী করে রুস্তম আলীর নামে মামলা দায়ের করেছে। বর্তমানে মৃত্যুর সংখ্য ৩২ জন এসে দাঁড়িয়েছে। আহতদের অনেকেই হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

আজ পাঁচ বছর ধরে রুস্তম আলী বাইরে বাইরে ঘুরছে। নানাবিধ চিন্তা ও পেরেশানীতে তার সুন্দর সুঠাম দেহ শুকিয়ে কংকালা সার হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন যাবৎ গার্মেন্টস গুলো বন্ধ থাকায় আয় উপার্জন একদম কমে গেছে। ব্যবসার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছে। এমনকি তার অনুপস্থিতিতে স্বার্থপর ও মতলববাজ বন্ধু-কর্মচারীরা তার কোটি কোটি টাকার সম্পদ আত্মসাত করে ফেলেছে।

রুস্তম আলীর অবর্তমানে মামলা চলতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত আদালতের রায় মোতাবেক হতাহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে তার অবশিষ্ট সম্পত্তির প্রায় সবটুকুই চলে গেল। এভাবে কেটে গেল আরও পাঁচ বছর। দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দেখা গেল কোটিপতি রুস্তম আলীর হাত একেবারেই শূন্য। বাড়ী গাড়ী সবকিছুই অন্যেরা দখল করে নিয়েছে। অবস্থা এতটাই শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে যে, এক মুটো খাবার ক্রয় করার মত সামর্থও তার অবশিষ্ট রইল না। অবশেষে ধার-কর্জ করে কিছুদিন চলল। কিন্তু এভাবে আর কত দিন চলা যায়। সে এখন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার পর্যায়ে উপনিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত জীবন সংগ্রামে পরাজিত অহংকারী রুস্তম আলী

সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, প্রয়োজনে সে ভিক্ষা করে খাবে তবুও পরিচিত লোকজন ও আত্মীয় স্বজনদের সামনে চেহারা দেখাবে না। তাই সে এক অপরিচিত এলাকায় গিয়ে উঠল।

নানাবিধ পেরেশানী ও বিভিন্ন রোগ-শোকের কারণে বেশ আগেই রুস্তম আলী কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং জীবন বাঁচাতে হলে ভিক্ষা করা ছাড়া তার সামনে এখন দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না। তাই এককালের কোটিপতি রুস্তম আলী আজ জীর্ণ-শীর্ণ দেহ নিয়ে ছেঁড়া কাপড় পরিধান করে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলো।

রুস্তম আলীর প্রথমা স্ত্রী আজ দুই বছর হল ইন্তেকাল করেছেন। আর দ্বিতীয় স্ত্রী জামিলাকে তার পিতা বাড়ীতে নিয়ে আরেকজন কোটিপতির নিকট বিবাহ দিয়েছেন। নতুন স্বামীর ঘরে জামিলা এখন পরম সুখে দিনাতিপাত করছে।

জামিলা ও তার দ্বিতীয় স্বামীর মধ্যে বয়সের ব্যবধানটা একটু বেশীই ছিল। তথাপি একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও আদর্শ স্বামী পেয়ে সে মহাখুশী। স্বামীর চরিত্র মাধুরীতে সে এতটাই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, তাকে কোন দিন তুমি বলার সাহসও তার হয়নি। বর্তমান স্বামীর সাহচর্য পেয়ে সে এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মত প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করে। স্বামীর কাছ থেকেই সে শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত শিখেছে। তার কাছে থেকেই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ধীরে ধীরে আত্মস্থ করেছে। এখন সে গান শুনে না। টিভি দেখেনা। বেপর্দায় চলাফেরা করে না। মোট কথা, পরশ পাথরের সংস্পর্শে যেমন লোহা সোনায় পরিণত হয় ঠিক তেমনি একজন খোদাভীরু আল্লাহ ওয়ালা স্বামীর সংস্পর্শে জামীলাও বহু গুণে গুনান্বিতা একজন আদর্শ নারীতে পরিণত হয়েছে। এরূপ স্বামী পাওয়ার কারণে সে সর্বদাই মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।

জামিলা সর্বদাই স্বামীর সাথে বসে এক প্লেটে খানা খায়। মাঝে মাঝে সে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্বামীর মুখে খাবার উঠিয়ে দেয়। স্বামীও এ ব্যপারে পিছিয়ে নেই। সেও তার প্রিয়তমার মুখে স্নেহভরে লুকমা উঠিয়ে দিতে থাকে। এভাবেই প্রত্যহ তাদের খাবারের পর্ব শেষ হয়।

বরাবরের মত আজও জামিলা তার প্রাণপ্রিয় স্বামীকে নিয়ে খাবার খেতে বসেছে। এখনো তারা খাওয়া শুরু করেনি। ঠিক এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে হাঁক ছেড়ে বলল, মাগো! আমাকে কিছু খাবার দিন। ক্ষুধার যন্ত্রণায় আর চলতে পারছি না। সামান্য খাবার দিয়ে আমার জীবন রক্ষা করুন।

ভিক্ষুকের ডাক শুনে জামিলার স্বামী বলল, আহা! লোকটি খাবারের জন্য কতই না কষ্ট করছে। তাড়াতাড়ি কিছু ভাত তরকারী প্লেটে উঠিয়ে দাও। আমি এক্ষনি তাকে খানা দিয়ে আসব। জামিলা বলল, আমার তো মনে হয় খানা দিয়ে আসার প্রয়োজন নেই। পাশের রুমে বসলে আমরা তাকে পরিতৃপ্তির সাথে পেট পূর্ণ করে খানা খাইয়ে দিতে পারি। তবে আপনি যা ভাল মনে করেন তাই হবে।

একথা বলে জামিলা জানালা দিয়ে ভিক্ষুকের দিকে তাকাল। তাকানোর সাথে সাথে স্বামী কিছু বুঝে উঠার আগেই সে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। স্বামী বেচারা হতভম্ব হয়ে গেল। কি থেকে কি হয়ে গেল কিছুই সে বুঝতে পারল না। সে জামিলার চিবুক ধরে নাড়া দিল। বারবার জিজ্ঞাসা করল, জামিলা! জামিলা!! তোমার কি হয়েছে? একটু খুলে বল তোমার কি হয়েছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু এত কিছুর পরও জামিলার কোন সাড়া শব্দ নেই। সে কোন কথাই বলছে না। কেবল দু'চোখ বেয়ে কয়েক ফোটা তপ্ত অশ্রু নীচে গড়িয়ে পড়ছে।

জামিলার স্বামী কিছুই বুঝতে না পেরে ঘর থেকে বের হয়ে ভিক্ষুককে সব কিছু খুলে বললো। জবাবে ভিক্ষুক বললো, আমিও তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে আপনি তার চোখে পানির ঝাপটা দিন। হুঁশ ফিরে এলে তার কাছ থেকেই সব কিছু জানা যাবে।

ভিক্ষুক পাশের রুমে বসা আছে। জামিলার স্বামী জামিলার হুঁশ ফিরানোর জন্য বারবার চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দিতে লাগলো। এভাবে অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর জামিলা চোখ খুললো। কিন্তু পরক্ষণেই একটি চিৎকার দিয়ে আবার বেঁহুশ হয়ে গেল।

জামিলার স্বামী বিভিন্ন দোয়া কালাম পড়ছেন। পূর্বের ন্যায় পানিও ছিটিয়ে দিচ্ছেন। এক সময় জামিলার জ্ঞান ফিরে আসলে সে ধীরে ধীরে উঠে বসতে চেষ্টা করলো। স্বামী তাকে বসতে সাহায্য করলো।

জামিলা যখন কিছুটা স্বাভাবিক হলো তখন স্বামী জিজ্ঞেস করল জামিলা তোমার কি হয়েছে? ভিক্ষুকের দিকে চাইতেই তুমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলে কেন? তুমি কি ভয় পেয়েছ?

জামিলা বলল, না, আমি ভয় পাইনি।

ঃ তাহলে তোমার অবস্থা এমন হল কেন?

ঃ এমনিতেই।

ঃ এমনিতেই কেউ বেঁহুশ হয় না। নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন কারণ আছে। তুমি সবকিছু খুলে বলো।

জামিলার কেন এমন হয়েছে তা সে স্বামীর নিকট বলতে রাজী ছিল না। তথাপি স্বামীর বারংবার পীড়াপীড়িতে বলতে বাধ্য হল।

জামিলা চোখের পানিগুলো কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বললো, আজ যে ভিক্ষুকটি আমাদের নিকট খানা চাইলেন তিনি ছিলেন আমার পূর্বের স্বামী। তিনিও আপনার মত বিশাল ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। বাড়ী-গাড়ী বিত্ত-বৈভব কোন কিছুরই কমতি ছিল না তার। ঢাকা গুলশান এলাকায় তার মত ধনী লোক খুব কমই ছিল। কিন্তু ভাগ্যের নিমর্ম পরিহাস! কালের চাকার আবর্তে আজকে তিনি পথের ভিখারী সেজেছেন।

এতটুকু বলে অবুঝ বালিকার ন্যায় জামিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তার কান্না দেখে স্বামীর হৃদয়েও ঝড় উঠলো। অশ্রু মালা তার গন্ডদ্বয়কেও ভিজিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর জামিলা নিজেকে সামলে নিয়ে অহংকারী স্বামী কিভাবে একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুককে ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল, কিভাবে তাকে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে খাদের নীচে ফেলে দিয়েছিল, কিভাবে আগুন লেগে স্বামীর সবকিছু জ্বলে পুড়ে ছাড়খার হয়ে গিয়েছিল কিভাবে সে পর্যায়ক্রমে আজকের এই বর্তমান অবস্থায় উপনীত হল তার সবই বিস্তারিত উল্লেখ করলো। সে আরও বললো, আমি যখন আমার প্রথম স্বামীকে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে কংকালসার অবস্থায় দেখতে পেলাম, তখন আমার মানসপটে একসাথে অতীতের সমস্ত চিত্র ভেসে উঠলো। আর এটা ছিল আমার বরদাশ্তের সম্পূর্ণ বাইরে। তাই আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেছি।

এবার জামিলার স্বামী বলল, জামিলা! তুমি কেবল ঘটনার অর্ধেক জান। বাকী অর্ধেক ইচ্ছে করলে আমার কাছ থেকে শুনে নিতে পার।

স্বামীর কথা শুনে জামিলা য্যার পর নাই বিস্মিত হল। সে বিস্ফারিত নয়নে স্বামীর মুখ পানে তাকিয়ে রইল। তার চেহারায় তখন একটি প্রশ্নবোধক অবস্থা স্পষ্টই পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

স্ত্রীর মনের হালত স্বামী ভাল করেই বুঝতে পারলো। তাই সে বলতে শরু করল-

তোমার পূর্বের স্বামী যে লোকটির সাথে দূর্ব্যবহার করেছিল, যাকে সে অহংকার বশতঃ ধাক্কা দিয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে খাদের নীচে ফেলে দিয়েছিল তার নাম আব্দুর রহীম। আর তোমার বর্তমান স্বামী আব্দুর রহীম এবং ঐ ভিক্ষুক আব্দুর রহীম এ দুজনের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কারণ আমিই ছিলাম সেই ভিক্ষুক, সেই সহায়-সম্বলহীন দুঃস্থ মানব। ঐ ঘটনার পর থেকেই আমার ভাগ্যের চাকা অতি ত্বরিত গতিতে ঘুরতে থাকে। ধীরে ধীরে আমার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। ব্যবসা বাণিজ্যের বিরাট সুযোগ পেয়ে যাই। সর্ব ক্ষেত্রেই আমি বরকত দেখতে পাই। এভাবে কয়েকবছর পর দেখা গেল আমি অঢেল সহায় সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছি। কয়েক কোটি টাকা আমার ব্যাংকে জমা হয়ে গেছে। অতঃপর এক পর্যায়ে আমার ছোট বেলার এক বন্ধুর মাধ্যমে তোমার আব্বার সাথে পরিচয় হওয়ার পর আমার সাথে তোমার বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা চলতে থাকে।

একদিন তোমার আব্বা আমার বন্ধুকে বলেছিলেন লোকটির বয়স যদিও বেশী কিন্তু তার সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তার দীনদারীতে আমি খুবই খুশি। আমি এতদিন যাবত এমন একটি লোকই খুঁজছিলাম। তাই আমি দেরী না করে কলিজার টুকরা জামিলাকে তার হাতে তুলে দিতে চাই।

বন্ধু আমাকে একথা জানানোর পর আমি এ ব্যাপারে পরামর্শ ও এস্তেখারা করি। এস্তেখারার ফলাফল খুবই ভাল হওয়ায় তোমাকে বধূ বানিয়ে ঘরে নিয়ে আসি।

স্বামীর মুখ থেকে কথাগুলো শুনে জামিলা আরও আশ্চার্যান্বিত হয়। ভাবে, অহংকারের সাজা আর বিনয়ের পুরস্কার বুঝি আল্লাহ তায়ালা এভাবেই দিয়ে থাকেন। অতঃপর গত কয়েকদিন পূর্বে একজন হক্কানী আলেমের মুখ থেকে শুনা পবিত্র কুরআনের একখানা আয়াতের তরজমা তার স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠে-

'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলুন, আল্লাহ তাআলাই সমস্ত রাজ্যের অধিপতি। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নাও। যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দাও এবং যাকে ইচ্ছা বেইজ্জত করো। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।' (সূরা আল- ইমরানঃ২৬)

মুহতারাম পাঠক বন্ধুগণ! দেখলেন তো কিভাবে আল্লাহ তাআলা অহংকারী লোকটিকে তার সম্মানজনক আসন থেকে নামিয়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে দিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরালেন আবার কিভাবে একজন মজলুম ভিক্ষুককে ইজ্জত সম্মানের শ্রেষ্টতম আসনে অধিষ্ঠিত করলেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে অহংকার পরিহার করে বিনয়ী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন

উল্লেখ্য যে, অহংকার নামক এ মারাত্মক ব্যধি থেকে পরিত্রানের জন্য পীর মাশায়েখগণ বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি এই যে, যখনই মনের মধ্যে কোন বিষয়ে অহংকার বোধ জাগবে অর্থাৎ জ্ঞান-গরিমা, রূপ-সৌন্দর্য, ধন-দৌলত, মান-সম্মান প্রভৃতির ব্যাপারে নিজকে অন্যের চেয়ে বড় মনে হবে তখন নিজকে সম্বোধন করে নিজেই প্রশ্ন করবে যে, আচ্ছা! তুমি যে এত অহংকার কর, নিজকে অপরের চেয়ে বড় মনে কর তুমি কি একটি বারের জন্যও খেয়াল করে দেখেছ যে, তুমি কে? কি তোমার পরিচয়? চিন্তা করে দেখ, তুমি তো সেই মাটিই, যাকে দিবারাত্রি লোকজন পদদলিত করে। তোমার মূল তো সেই একবিন্দু দুর্গন্ধময় অপবিত্র পানিই যা নিকৃষ্ট প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে থাকে। এক্ষণে যদি তোমার মধ্যে কোন গুণ বা যোগ্যতা এসে থাকে, তা তোমার বাহুবলে অর্জিত নয়, বরং আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে তোমাকে তা দান করেছেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে এখনই তোমার মান-সম্মান, রূপ-সৌন্দর্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-দৌলত সবকিছু কেড়ে নিয়ে তোমাকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে পারেন। এতদসত্বেও কোন কামালিয়াতের উপর ফখর করা আহমকী নয় কি?

হে পরওয়ার দেগার! তুমি আমাদের সকলকে বুঝার তাওফীক দান কর। ❐

যেভাবে বইটি সাজানো

পর্দাহীনতার নগদ শাস্তি

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। আব্দুর রহীম নামের এক ২২/২৩ বছরের তরুণ। মাদরাসায় পড়াশুনা করে। দেখতে শুনতে মোটামুটি খারাপ নয়। দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার বন্ধে বরাবরের মত এবারও সে আব্বা আম্মা ও আত্মীয় স্বজনকে দেখার উদ্দেশ্যে গ্রামের বাড়ীতে এসেছে।

শরীফ আব্দুর রহমানের অন্তরঙ্গ বন্ধু। উভয়ই একে অপরকে শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই মহব্বত করে, ভালবাসে। হাশরের ময়দানে আরশের ছায়া প্রাপ্তির আশায়ই তাদের এ বন্ধুত্ব। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন, যে দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতিত অন্য কোন ছায়া হবে না সেদিন আল্লাহ পাক সাত প্রকার ব্যক্তিকে আপন রহমতের ছায়ার নীচে আশ্রয় দান করবেন। তন্মধ্যে এক প্রকার হল, এমন দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই একে অপরকে ভালবাসে এবং সেই জন্য একত্রিত হয় এবং সেই জন্যই পৃথক হয়।

আব্দুর রহীম ও শরীফের বাড়ী একই গ্রামে। বন্ধের ছুটিতে তারা এক সাথেই বাড়ীতে এসেছিল। আগামীকাল মাদরাসা খোলা। তাই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মাদরাসা খোলার একদিন আগেই তারা মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেইন রোডে এসে বাসের অপেক্ষা করতে লাগল।

সেখানে তাদের মত আরও বহু লোক বাসের অপেক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে তিন চারটি বাস চলে গেছে। যাত্রীদের প্রচন্ড ভীড় হওয়ায় তারা উঠতে পারেনি। পরে সময়ের দিকে লক্ষ্য করে তারা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল যে, এখন যে বাসই আসুক, তাতে যে কোন উপায়ে তারা উঠার চেষ্টা করবে।

একটু পরেই একটি বাস তাদের সামনে এসে থামল। তারা গাড়ীতে উঠতে যাবে ঠিক এমন সময় একজন আলট্রা মর্ডান যুবক

তাদের লক্ষ্য করে বলল, এই মৌলভীরা! আমাদের সাইড দাও। তোমরা পরে উঠবে।

আব্দুর রহীম ও শরীফ আওয়াজ শুনে পিছনে তাকাল। দেখল, একটা আধুনিক ছেলে অর্ধ নগ্না একটি মেয়েকে নিয়ে বাসের দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটির পরণে আট শাট কাপড়। কাপড় তো নয় যেন শরীরের কৃত্রিম চামড়া। মুখে কড়া প্রসাধনী। মাথায় কোন কাপড় নেই। কাঁধে এক টুকরা ফ্যাশনী পাতলা উড়না। ভাবখানা এমন যেন, নারীদের অপ্রকাশিত আকর্ষণীয় অঙ্গগুলো প্রদর্শন করতেই তার এই নিখুঁত পরিকল্পনা।

যা হোক, মেয়েটির উপর চোখ পড়ার সাথে সাথেই তারা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। কারণ তারা জানত যে, বেগানা মেয়েদের উপর অনিচ্ছাকৃত ভাবে দৃষ্টি পড়লে গোনাহ হয় না ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করলে কিংবা বারবার তাকালে এতে কবীরাহ গোনাহ হয়, যা তাওবা ব্যতিত মাফ হয় না।

দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার পর তারা ভাবল আমরাও তো যাত্রী। তাহলে আমাদেরকে এত নীচু চোখে দেখবে কেন? তাই যুবকের কথায় কর্ণপাত না করে তারা গাড়ীতে উঠার জন্য পা বাড়াল। এমন সময় যুবকটি বন্ধু শরীফকে সজোরে পিছন থেকে টান মেরে রাগত স্বরে বলল, তোদেরকে বলেছি পরে উঠবি। তাহলে সামনের দিকে পা বাড়ালি কেন? তোরা কি চিন্‌স না আমি কে? আরেকবার আগে উঠার ধৃষ্টতা দেখালে বাসের চাকায় পিষ্ট করে ফেলব। যুবকটি কথা বলতে বলতে কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সাথের মেয়েটিকে নিয়ে গাড়ীতে উঠল এবং একই সিটে দু'জন পাশাপাশি বসল।

যুবকটির এ উদ্ধত আচরণে তারা খুবই দুঃখ পেল। বাসের যে সকল যাত্রী ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করল তারাও ভীষণভাবে মর্মাহত হল। তাদের একজন ছেলেটিকে লক্ষ্য করে বলেই ফেলল, ভাই! হুজুরদের সাথে এমন আচরণ করা তোমার মোটেও ঠিক হয়নি। তুমি যদি এদের মূল্য জানতে তাহলে কখনোই এমনটি করতে না। কিন্তু ছেলেটি তার কথায় কর্ণপাত না করে পাশে বসা সুন্দরী মেয়েটির সাথে বিভিন্ন প্রকার গালগল্প ও হাসাহাসিতে মেতে উঠল।

আব্দুর রহীম মর্ডান যুবকটিকে লক্ষ্য করে কিছু বলতে যেয়েও বলল না। সে শরীফকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে এবং ঐ যুবকটির পিছনে দুটি সীট খালি থাকায় সেখানে গিয়ে বসে পড়ে।

সদর রোড ধরে গাড়ী তীরবেগে এগিয়ে চলছে। পিছনে ফেলে যাচ্ছে অনেক বন-বনানী ও নয়নাভিরাম সবুজ দৃশ্য। নিপুণ কারিগর আল্লাহ তায়ালা যেন তার অপরিসীম নৈপূণ্য ও শৈলীতে সৃষ্টি করেছেন এসব সবুজের সমারোহ। বাসের প্রায় সকল যাত্রীগণ রাস্তার দু'পাশের মনোরম দৃশ্যের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন।

আব্দুর রহীম বন্ধু শরীফের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করতে করতে সময় কাটাচ্ছে। হঠাৎ ঐ যুবকটির প্রতি দৃষ্টি পড়তেই সে দেখল ওরা তাদেরকে লজ্জিত করার উদ্দেশ্যে বিদ্রুপের হাসি হাসছে। এমন সময় গাড়ীটি শরীফদের গন্তব্যে এসে থামলে তারা নিজ নিজ আসবাব পত্র নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ল।

তারা যেখানে নামল সেখান থেকে মাদরাসার দুরত্ব ৪/৫ কিলোমিটার। এ পথটুক তাদেরকে হেঁটে যেতে হবে। কেননা পাহাড়ী রাস্তা হওয়ার কারণে এ পথে কোন গাড়ী বা রিক্সা চলাচল করে না। অগত্যা তারা দু'জন পাহাড়ের আঁকাবাঁকা গলিপথ ধরেই মাদরাসা অভিমুখে হেঁটে চলছে।

পথে ঘটে যাওয়া ঘটনার দুঃখ-বেদনা এখনো তাদের হৃদয় থেকে মুছে যায়নি। উপরন্তু তারা চিন্তা করছিল, হায় আফসোস! পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষিত মা-বোনদের বেহায়াপনা কত চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তারা কি আল্লাহ তাআলার এ বাণী শ্রবণ করেনি "তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো। বর্বর যুগের মেয়েদের ন্যায় সাজসজ্জা করে বের হয়ো না।" (সুরা আহযাব ঃ৩৩) তারা কি রাসূল (সা.) এর এ হাদীস শোনেনি "মহিলারা হল পর্দায় থাকার বস্তু। সুতরাং যখন তারা (পর্দা উপেক্ষা করে) বাইরে আসে তখন শয়তান তাদের প্রতি উকি মারে।" (তিরমিযি)

পথ চলতে চলতে একসময় আব্দুর রহীম পিছনের দিকে তাকাল। দেখল, গাড়ীর ঐ যুবকটি অর্ধনগ্ন অপরুপা সুন্দরী মেয়েটির হাত ধরে

হাসি তামাশা আর রসালাপ করতে করতে তাদের পেছনে পেছনে দিকে আসছে।

আব্দুর রহীম তার দৃষ্টি সংযত করল। বন্ধু শরীফকেও পিছনে তাকাতে নিষেধ করল। এভাবে সামান্য পথ অতিক্রম করার পর তারা কয়েকটি মাস্তান ধরণের ছেলে দেখতে পেল। তাদের একজন বলল, বহুদিন পর একটা ভাল শিকার ভাগ্যে জুটল। বয়সে একেবারে কচি। আরেকজন বলল, এত অপরুপা সুন্দরী ললনা কোত্থেকে এলো রে? আজকের ভাগ্যটা তাহলে ভালই। ইচ্ছে মত মনের সাধ মিটানো যাবে।

তাদের কথাগুলো অনুচ্চ আওয়াজে বললেও নীরব নিঃশব্দ নির্জন পাহাড়ী এলাকায় শরীফরা সবই শুনলো। তাদের গা শিউরে উঠলো। মেয়েটি উগ্র হলেও তার চিন্তায় তাদের হৃদয়মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। এসব দুর্বৃত্ত নর পশুদের হাত থেকে মেয়েটিকে কিভাবে বাঁচানো যায় সে চিন্তায় তারা উভয়েই বিভোর হয়ে গেল।

তাদের চিন্তা এখনো শেষ হয়নি। কিছু বুঝে উঠার আগেই তারা দেখল, দুজন মাস্তান অস্ত্রের মুখে যুবকটির চোখ-মুখ ও হাত-পা বেঁধে ফেলল। এমন সময় মেয়েটি দৌঁড়ে এসে আমাদের নিকট আশ্রয় নিতে চাইল। কিন্তু নিকটে পৌঁছার পূর্বেই মাস্তানরা মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে পাহাড়ের ভিতর নিয়ে চলে গেল। এ সময় মেয়েটি বাঁচাও বাঁচাও বলে আর্তচিৎকারে ফেটে পড়ল। নিজেকে মানবরুপী হায়েনাগুলোর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করলও। কিন্তু কোন ফল হল না। মাস্তানদের সকলের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় শরীফদের পক্ষেও মেয়েটিকে সাহায্য করা সম্ভব হলো না।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটির কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। এ মুহূর্তে মেয়েটির উপর দিয়ে কি পরিমাণ কিয়ামতসম পাশবিক নির্যাতন চলছিল তা বুঝতে শরীফদের বাকী রইল না। কিন্তু শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা মেয়েটির জন্য কিছুই করতে পারলো না।

দু'জন মাস্তান যুবকটিকে হাত পা ও চোখ বেঁধে পাহারা দিচ্ছিল। একটু পরে তারাও নিজেদের ভাগ লওয়ার জন্য মেয়েটির কাছে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও শরীফরা যখন দেখল

মাস্তানগুলো পাহাড়ের ভেতর থেকে বের হচ্ছে না তখন তারা ঐ যুবকটির বাধন খুলে দিল।

বন্ধনমুক্ত হয়ে যুবকটি অঝোরে কাঁদতে লাগল এবং অত্যন্ত বিনীত স্বরে আব্দুর রহীমদের পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল।

এ সুযোগে আব্দুর রহীম বলল, আমরা তোমাকে একটি শর্তে ক্ষমা করতে পারি। তা হলো, তুমি আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর, আর কোনদিন মেয়েদের নিয়ে বেপর্দাভাবে ঘুরবে না। ইসলামের অনুপম জীবন ব্যবস্থাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করবে। মহানবী (সা.) এর প্রদর্শিত পথে জীবন পরিচালনা করবে এবং কখনও কোন হুজুর মাওলানাকে অবজ্ঞা করবে না। তাচ্ছিল্যের চোখে দেখব না। মেনে রাখবে, একজন প্রকৃত আলেমের মূল্য আল্লাহ পাকের নিকট লক্ষ কোটি আবেদের চাইতেও উত্তম।

আব্দুর রহীমের কথাগুলো যুবকটি খুবই মন দিয়ে শুনল। সে বুঝতে পারল হুজুরদের সাথে বেয়াদবী এবং পর্দাহীনতার দরুনই আমাদের এ করুণ অবস্থা। তাই সে আব্দুর রহীমের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করল।

এবার আবদুর রহীমরা যুবকসহ আরো কয়েকজনকে নিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্য বনের ভিতর ঢুকে গেল। অনেক খুঁজাখুঁজির পর তারা মেয়েটিকে বেহুঁশ অবস্থায় একটি ঝোপের আড়ালে দেখতে পেল। তার গায়ে কোন কাপড় ছিল না। দেহের বিভিন্ন অংশে পাশবিক নির্যাতনের চিহ্নগুলো দূর থেকেই পরিলক্ষিত হচ্ছিল। মেয়েদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্ব কতটা নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক কায়দায় লুণ্ঠিত হতে পারে তা দেখে সকলেই হতবাক হয়ে গেল। বেদনার অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এলো তাদের নয়নগুলো।

যুবকটিই প্রথম মেয়েটির কাছে গিয়ে কাপড় দিয়ে তার নগ্ন দেহ আবৃত করল। তারপর সে অন্যদের সহযোগীতায় মেয়েটিকে নিয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালে চলে গেল। ঘটনা এখানেই শেষ।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ জাতীয় ঘটনা আজ আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে। যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু প্রশ্ন

হলো, এর কারণ কি? কে এজন্য দায়ী? এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলব, এরূপ দুর্ঘটনার জন্য সবচেয়ে বড় ও মূল কারণ হলো পর্দাহীনতা। মেয়েরা যদি পূর্ণরূপে পর্দা করে বোরকা পরে আপাদমস্তক ঢেকে শালীনভাবে চলাফেরা করত তাহলে কখনোই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। অবশ্য এ সকল ঘটনার জন্য প্রশাসনিক দূর্বলতা, ধর্মহীনতা, নৈতিক মুল্যবোধের অবক্ষয়, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও ছবি প্রদর্শন এবং সর্বোপরি সহশিক্ষা ও নারী পুরুষের একক কর্মক্ষেত্রও কম দায়ী নয়। লোভী বিড়ালের সামনে দুধের পেয়ালা রেখে বিড়ালকে পেয়ালায় মুখ দিতে বারণ করা যেমন বোকামী, ঠিক তেমনি একক কর্মক্ষেত্র ও সহ শিক্ষার মাধ্যমে নারী-পুরুষকে পাশাপাশি বসার সুযোগ দিয়ে তাদের চরিত্র নিষ্কলুষ রাখার এবং নারী নির্যাতন বন্ধ করার শাহী ফরমান জারী করাটাও ততটা নির্বুদ্ধিতা। নারী-পুরুষের দৃষ্টান্ত ঠিক মোম ও আগুনের মত। চুম্বক ও লোহার মত। আগুনের সামনে মোম নিলে তা যেমন গলে যায়, চুম্বকের সামনে লোহা নিলে তা যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে অনুরূপভাবে নারী পুরুষ একত্রিত হলে তা একে অপরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করবেই। নারীর কোমল চাহনী, হাস্য রসিকতা ও মধুর কণ্ঠস্বর যে কোন পুরুষের হৃদয়কে মোমের মত গলাবেই। ফলে ক্ষতি যা হওয়ার তাই হবে। তাই হচ্ছে। আল্লাহপাক আমাদের বুঝার তাওফীক দান করুন। পরিশেষে একটি ছন্দের মাধ্যমে চলমান আলোচনার সমাপ্তি টানছি।

সতী নারী পতি ভক্তা থাকবে তুমি আড়ালে
নইলে তোমায় গ্রাস করবে পুরুষ নামক বিড়ালে।

(আলোচ্য ঘটনাটি সিলেট জেলার গওহরপুর গ্রামের
একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

পবিত্র মক্কা নগরী। কাবা গৃহকে কেন্দ্র করে হাজী সাহেবরা লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলে তাওয়াফ করে চলেছেন। তাওয়াফকারীদের মাঝে অনেক মহিলাও রয়েছেন। কেউ কারো দিকে ভ্রুক্ষেপ করছে না। খোদার সান্নিধ্য লাভের আশায় সকলেই নিজ নিজ তাওয়াফ ও হজ্বের অন্যান্য কাজ কর্ম পালনে ব্যস্ত।

জনৈক বুযুর্গ তাওয়াফের সময় হৃদয়ের সমস্ত প্রেম-ভালবাসা মিশ্রিত করে মহান আল্লাহকে সম্বোধন করে বলছিলেন, লাব্বাইক। আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইক লা শারীকালাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নেয়মাতা লাকা ওয়ালমুল্‌ক। লা শারীকালাক।

"হে প্রভূ! বান্দা তোমার দরবারে হাযির। তোমার গোলাম উপস্থিত। তুমিই একমাত্র আল্লাহ। তোমার কোন শরীক নেই। উপস্থিত, গোলাম তোমার দরবারে উপস্থিত! সমস্ত প্রশংসা এবং নেয়ামত তোমারই। সমস্ত কৃতজ্ঞতা তোমারই জন্য। তোমার কোন অংশীদারও নেই।"

বুযুর্গ তাওয়াফ করছিলেন। হঠাৎ তিনি তার সামনে একটি মেয়ে দেখতে পেলেন। মেয়ের কাঁধের উপর একটি সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা ছিল। বাচ্চাটিকে কাঁধে নিয়ে সেও তাওয়াফ করছিল। তাওয়াফের এক পর্যায়ে মেয়েটি বলে উঠলো, হে করীম! হে করীম! আমার ও তোমার মধ্যকার সেই সময়টুকু কতই না গুরুত্বপূর্ণ! কতই না কৃতজ্ঞতার!! কতই না স্মরণ রাখার যোগ্য!!!

মেয়েটির এরূপ কথা শুনে বুযুর্গ খুবই অবাক হলেন। তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, মা! দোয়ার মধ্যে তুমি যে সময়ের কথা উল্লেখ করেছ সেটি কোন্ সময়? ঐ সময়ে এমন কি ঘটেছিল যে, তুমি তার উল্লেখ করে বারবার নিজের আবেগ প্রকাশ করছ?

মেয়েটি বললো, জনাব! সে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। যে সময় ঐ ঘটনা ঘটেছিল ঐ সময়ের স্মৃতি কখনো আমার হৃদয় থেকে মুছে যাবে

যেভাবে বইটি সাজানো

না। আজীবন তা আমার মনে থাকবে। আপনি যখন আমার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাটি শুনতে চাচ্ছেন তাহলে শুনুন। এ বলে সে শুরু করলো অতীতে ঘটে যাওয়া তার চমকপ্রদ কাহিনী–

একদা আমি কোন এক জরুরী প্রয়োজনে ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলার সাথে সফর করছিলাম। সফরের এক পর্যায়ে অন্য কোন যানবাহন নিয়ে চলাচল অসম্ভব বিধায় বাধ্য হয়ে আমাদেরকে একটি বড় নৌকায় আরোহণ করতে হল। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে চলছিল আমাদের নৌকাটি। এভাবে বেশ কয়েক ঘন্টা চলার পর আমরা সমুদ্রের এমন এক স্থানে পৌঁছলাম যেখান থেকে স্থলভাগের কিছুই দেখা যায় না। চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি। বিশাল বারি রাশিতে একটি ছোট্ট খড়-কুটোর ন্যায় হেলে-দুলে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছি আমরা।

কিন্তু খোদার কি মর্জি! মুহূর্তের মধ্যে ভয়ংকর রূপ ধারণ করল সমুদ্র। শুরু হল প্রলয়ংকরী ঝড়। নৌকা চালকরা তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো। নৌকার পাল ছিড়ে খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেল। এক সময় ঝড়ের প্রচন্ড আঘাতে আমাদের নৌকাটি টুকরো টুকরো হয়ে ডুবে গেল।

নৌকা ডুবে যাওয়ার পর এ বিশাল সমুদ্র বক্ষে মৃত্যু ছাড়া আমাদের জন্য দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না। একে একে সবাই সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল। সলিল সমাধি হল সকলেরই।

কিন্তু খোদার কি অসীম কুদরত! আমি আমার একমাত্র বাচ্চাটিকে নিয়ে নিষ্ঠুর মৃত্যুর পেয়ালা পান করার জন্য তৈরী নিচ্ছি, ঠিক এমন সময় সামনে দেখতে পেলাম নৌকার একটি ভাঙ্গা তক্তা। এ চরম মুহূর্তে কাঠের তক্তাটি দেখতে পেয়ে আমি কত যে খুশি হয়েছিলাম তা আপনাকে ভাষায় বুঝাতে পারবো না আমি।

যা হোক কাঠের তক্তাটিকে আমি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাহায্য মনে করে বাচ্চাটিকে নিয়ে অতি দ্রুত তাতে উঠে পড়ি। অতঃপর সমুদ্রের অথৈই পানিতে ভাসতে থাকা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিলো না।

ইতিমধ্যে ঝড় থেমে গেছে। সমুদ্র এখন অনেকটা শান্ত। এ জনমানবহীন সমুদ্র বক্ষ থেকে কোনদিন তীরে উঠতে পারবো কি-না সে চিন্তাই করছিলাম আমি। তবে আমার এতটুকু ভরসা ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদেরকে বাঁচাতে চান তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি আমাদেরকে মারতে পারবে না। তিনি পরম করুণাময়। অসীম দয়ালু। তিনি যখন আমাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কাষ্ঠ খন্ডের ব্যবস্থা করেছেন, সুতরাং অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই সম্পন্ন করবেন।

ঘটনাটি রাতের বেলায় হওয়ায় আশেপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় আমি আদরের সন্তানটিকে কোলে নিয়ে ভোর হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম। সাথে সাথে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করে বলছিলাম-

"হে আল্লাহ! তুমিই কেবল আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার। তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই। সুতরাং তুমি আমাদেরকে হেফাযত কর।" এভাবে দোয়া ও রোনাজারী করতে করতে ভোর হয়ে এলো। সকালের সোনালী রবি দিন শুরু হওয়ার আগাম বার্তা জানিয়ে দিল। রাতের অন্ধকার কেটে যাওয়ায় এখন বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু কোথাও কোন নৌকা বা জাহাজ নযরে পড়লো না।

আমি আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তির চিন্তায় বিভোর। এমন সময় একটু দূরে অপর একটি তক্তায় একজন হাবশীকে ভাসতে দেখি। সে আমার নিকট আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ হাত দিয়ে পানি সরাতে সরাতে এক সময় সে আমার তক্তার নিকট এসে গেল এবং এক লাফে আমার নিকট চলে এলো। এ নির্জন জনমানবহীন সমুদ্রবক্ষে একজন মানুষ পেয়ে আমি বেশ খুশিই হয়েছিলাম। কিন্তু হাবশী লোকটির পরবর্তী কর্মকান্ড আমাকে কেবল ব্যথিতই করেনি, রীতিমত আশ্চর্যান্বিতও করেছে।

লোকটি আমার তক্তায় চলে আসার পর আমি তাকে সম্বোধন করে বললাম, এ চরম বিপদ মুহূর্তে আপনাকে পেয়ে অনেক খুশি হয়েছি

আমি। মনের ভয় ভয় ভাব অনেকটা দূর হয়ে গেছে। আপনার উপস্থিতি আমার মনের ভিতরে অনেক সাহস সঞ্চয় করেছে।

আমার কথা শুনে সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। কামনার আগুন তার চোখে মুখে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হলো। তারপর সে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করে বললো,

তুমি, আমি তো একই বিপদের সম্মুখীন। বিপদ থেকে বাঁচার চিন্তাতো করতেই হবে। তবে তার আগে এই নির্জন স্থানে মনের খাহেশটা একটু পূর্ণ করে নিলেও তো মন্দ হয়না। এতটুকু বলে সে আমার আরও নিকটবর্তী হলো।

লোকটির কথা শুনে আমার চিৎকার করে কাঁদতে মনে চাইল। এ বিপদ মুহূর্তে একজন মানুষ পেয়ে আমি যে আনন্দবোধ করেছিলাম, ক্ষণিক পরেই সে আনন্দ- ক্ষোভ, পেরেশানী, ঘৃণা ও ধিক্কারে পরিণত হলো। আমি বললাম, এ মহাবিপদের সময়তো ইবাদত করেও রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই, আর আপনি আমার সাথে নাপাক বাসনা চরিতার্থ করতে চাচ্ছেন? অসৎ কর্মে লিপ্ত হতে চাচ্ছেন? আপনার মধ্যে কি মানবতা, মনুষ্যত্ব ও খোদার ভয় বলতে কিছুই নেই?

মেয়েটির কথা শুনে লোকটি আবারও হাসল। তারপর মুখ ভ্যাংচিয়ে বললো, আরে রাখ তোমার মানবতা আর মনুষ্যত্বের বুলি। আগে কাজ করতে দাও। তারপর অন্য কিছু চিন্তা করা যাবে। আমি খোদার কসম করে বলছি, যে কোন উপায়ে আমি আমার খাহেশ পূর্ণ করেই ছাড়ব।

মেয়েটি এখন নিরুপায়। আপন সতীত্ব রক্ষার ব্যাপারে ভীষণভাবে চিন্তিত। সে মনে মনে আফসোস করে বলতে লাগলো, হায়! এভাবে ইজ্জত হারানোর চেয়ে সমুদ্রে ডুবে যাওয়াও অনেক ভাল ছিল।

হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধির উদয় হলো। সে আপন ছেলেটিকে চিমটি কেটে কাঁদিয়ে ফেললো। উদ্দেশ্য ছিল, সামনে দন্ডায়মান মানুষরূপী হায়েনাটির কাছ থেকে কিছু সময় নেয়া। ছেলেটি কেঁদে উঠলে মেয়েটি বলল, ঠিক আছে, তাকদীরে যা আছে তা-ই হবে। তবে তার আগে বাচ্চাটিকে একটু ঘুম পাড়ানোর সুযোগ দাও।

যেভাবে বইটি সাজানো

পাষন্ড লোকটি মেয়েটির কথায় বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করলো না। সে মেয়েটির কোল থেকে বাচ্চাটিকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। অতঃপর সে বললো, আমার ইচ্ছা পূরণে এ মুহূর্তে এ বাচ্চাটিই ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। তাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে সে বাধা অপসারণ করলাম। এ বলে সে এক'পা দু'পা করে মেয়েটির দিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

এদিকে মেয়েটি ভয়ে জড় সড় হয়ে খোদার দরবারে ফরিয়াদ করে বললো, "হে সর্ব শক্তিমান খোদা! তুমি সব কিছুই পার। তোমার অসাধ্য কোন কিছুই নেই খোদা! আমার এ মুহূর্তের বিপদ সম্পর্কে তুমি পূর্ণ অবগত আছ। সবকিছুই দেখছ তুমি। হে পরওয়ারদিগার! তোমার কুদরতী শক্তি দ্বারা এই হাবশীর হাত থেকে আমার ইজ্জত রক্ষা কর।

মেয়েটির দোয়া এখনো শেষ হয়নি। ঠিক এমন সময় সমুদ্র থেকে একটি ভয়ংকর জানোয়ার ভেসে উঠল এবং সাথে সাথে হাবশী লোকটিকে লোকমা বানিয়ে সমুদ্রে ডুবে গেল। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরতের দ্বারা একজন সতী-সাধ্বী নারীর ইজ্জত রক্ষা করলেন।

ঘটনার পরবর্তী অংশ আরও বেশী বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক। মেয়েটি বললো, তারপর আমার তক্তাটি ভাসতে ভাসতে সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি চরে গিয়ে ঠেকল। সেখানে কোন লোকজন ছিল না। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে উক্ত চরে ঘাস পানি খেয়ে চারদিন কাটিয়ে দিলাম। পঞ্চম দিন একটি বড় নৌকা দৃষ্টিগোচর হল। আমি একটি উঁচু টিলার উপর উঠে কাপড় নেড়ে নৌকা ভিড়ানোর জন্য তাদেরকে আহবান করলাম। অবশেষে তাদের তিনজন লোক একটি ছোট নৌকায় করে আমার নিকট আসল এবং আমাকে সাথে নিয়ে তাদের বড় নৌকায় তুললো।

নৌকায় উঠার পর দেখলাম আমার সেই ফুটফুটে বাচ্চাটি একজন লোকের কোলে খেলাধুলা করছে। সাথে সাথে আমি ছেলেটির কাছে দৌড়ে গেলাম এবং তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলাম, এ তো আমার বাচ্চা! আমার কলিজার টুকরা!

এ দৃশ্য দেখে নৌকার লোকজন বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? আমি বললাম, না, আমি পাগল হইনি। আমার বিবেক-বুদ্ধি সম্পূর্ণ ঠিক আছে। একথা বলে আমি তাদেরকে পূর্ণ ঘটনা শুনিয়ে দিলাম।

তারা আমার কাহিনী শুনে বিস্ময়ে হা করে রইল। কিছুক্ষণ তাদের মুখ থেকে কোন কথা বের হলো না। তারপর তাদের একজন বললো, এবার তুমি বাচ্চার কাহিনী শুন। এতে তুমিও আশ্চর্য হবে।

লোকটি বললো, আমরা অনুকূল হাওয়ায় বড় আরামের সাথে নৌকা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সমুদ্র হতে একটি জানোয়ার ভেসে উঠল। এই বাচ্চাটি তখন ঐ জানোয়ারের পিঠের উপর বসা ছিল। ইতিমধ্যে আমরা একটি গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলাম- এক্ষুনি এই বাচ্চাটি উঠিয়ে নাও। নচেৎ তোমাদের নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হবে। আমরা তখন কালবিলম্ব না করে বাচ্চাটিকে উঠিয়ে নিলাম। তোমার এবং এই ছোট্ট বাচ্চার আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে আমরাও প্রতিজ্ঞা করলাম আমরাও আর কখনো পাপ কাজে লিপ্ত হবো না।

এই ঘটনা থেকে দুটি বিষয় পরিষ্কার বুঝে আসে। তন্মধ্যে একটি হলো, মানুষ যখন বিপদের সম্মুখীন হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাঁর দিকেই পূর্ণরূপে ধাবিত হয় তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করেন এবং তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আর দ্বিতীয়টি হল, অত্যাচারী-জালেমদের শাস্তি আল্লাহ তায়ালা অনেক সময় দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। আর আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি তো আছেই। (সূত্র ঃ ফাযায়েলে হজ্ব)

হে খোদা! তোমার অসীম কুদরতে আমাদেরকে যাবতীয় পাপ থেকে হেফাজত কর। ❒

এমন শাসকের আজ বড় প্রয়োজন

আজ থেকে বহুদিন আগের কথা। তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন। উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহিষ্ণুতা ও চরিত্র মাধুরীর অনুপম দৃষ্টান্তের কারণে আজও তাঁর নাম ইতিহাসের সোনালী পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। উপরন্তু তিনি ছিলেন একজন বীর বাহাদুর ও সাহসী যোদ্ধা। তাই প্রায়ই তিনি যুদ্ধের বিভিন্ন কলা-কৌশল ও তীর চালনার অনুশীলন করতেন।

একদিনের ঘটনা। সুলতান গিয়াসউদ্দীন তীর চালনার অনুশীলন করছেন। সামনে একটি নিশানা ঠিক করে বারবার তিনি তীর ছুঁড়ে আপন দক্ষতার পরীক্ষা নিচ্ছেন। এভাবে অনেকক্ষণ অনুশীলন করার পর হঠাৎ একটি তীর হাত ফসকে এক বৃদ্ধ মহিলার ছেলের গায়ে মারাত্মকভাবে আঘাত হানে। ফলে ক্ষত স্থান থেকে দর দর করে রক্ত ঝরতে থাকে এবং ছেলেটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

বৃদ্ধা মহিলার স্বামী বহু আগেই ইন্তেকাল করেছেন। তার আর কোন ছেলে মেয়েও নেই। বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছেলেটিও আজ সুলতানের তীরের আঘাতে মারাত্মক আহত। এমতাবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এক সময় তিনি বিচারের জন্য কাযীর দরবারে উপস্থিত হলেন।

সে সময় আদালতের বিচারপতি ছিলেন কাযী সিরাজুদ্দীন। বৃদ্ধা মহিলা ঘটনার বর্ণনা দিয়ে কাযী সাহেবের নিকট ন্যায় বিচারের প্রার্থনা জানালেন। এ অভিযোগ স্বয়ং সুলতানের বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বেও কাযী সিরাজুদ্দীন কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ করলেন না। বরং তিনি সাথে সাথে সুলতানের বিরুদ্ধে সমন জারী করে তাঁকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

সমন পেয়ে সামান্যতম কালক্ষেপন না করে সুলতান গিয়াস উদ্দীন কাযীর দরবারে আসামী হয়ে হাযির হলেন। অন্যান্য সময় সুলতান এলে তাঁকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করা হতো, প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেওয়া হতো। কিন্তু আজ সুলতানের জন্য কিছুই করা হলো

না। বরং কাযী সাহেব অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে সুলতানকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে নির্দেশ দিলেন।

সুলতান আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর কাযী সিরাজুদ্দীন তাঁকে বৃদ্ধা মহিলার অভিযোগ পাঠ করে শুনিয়ে বললেন, এবার বলুন বৃদ্ধার অভিযোগ ঠিক কিনা?

ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক সুলতান গিয়াসউদ্দীন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, জ্বী হ্যাঁ, বৃদ্ধার অভিযোগ সম্পূর্ণ সঠিক। এতে বিন্দুমাত্রও ভুল নেই। তবে মহামান্য আদালত! তীর চালনার অনুশীলনের সময় একটি তীর আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় হাত থেকে ফসকে গিয়ে বৃদ্ধা মহিলার ছেলের গায়ে আঘাত করেছে। যদিও এটি ছিল আমার একেবারেই অনিচ্ছাকৃত কাজ, তারপরেও এজন্য আমিই অপরাধী।

সুলতানের বক্তব্য শেষ হলে কাযী সিরাজুদ্দীন বললেন, আপনি যেহেতু অপরাধী সেহেতু আপনার সামনে এখন দু'টি পথ খোলা আছে। এ দু'টির একটি আপনাকে অবশ্যই বেছে নিতে হবে। হয়তো আপনি এ বিধবা মহিলার সাথে বিষয়টি আপোষে মিটিয়ে নিবেন, নয়তো আদালত আপনার বিরুদ্ধে যে কঠোর শাস্তির বিধান দিবে তা নির্দ্বিধায় মেনে নিবেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আসামীর কাঠগড়া থেকে নেমে বৃদ্ধ মহিলার কাছে গেলেন। প্রথমেই তিনি এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য বৃদ্ধার কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চাইলেন। তারপর বললেন, মা! আপনার ছেলের চিকিৎসার জন্য যত টাকার প্রয়োজন হবে তা আমি আপনাকে দিয়ে দেব। এছাড়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতাও আমি করবো। আমি আপনার কাছে আবারও ক্ষমা চাচ্ছি। মেহেরবানী করে আমাকে ক্ষমা করে দিন।

সুলতানের অমায়িক ব্যবহারে বৃদ্ধা মহিলা অত্যন্ত খুশি হলেন। উপরন্তু তিনি একথা ভেবে সীমাহীন আশ্চর্যবোধ করলেন যে, একজন অসহায় সাধারণ মহিলার সাথে একজন সুলতান কিভাবে এতটা নম্র ভদ্র ও শালীন ব্যবহার করলেন। তাই বিধবা মহিলা বিচারপতির সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, মহামান্য আদালত! সুলতানের অপূর্ব মহানুভবতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। আদর্শবান এ মহান সুলতানের

বিরুদ্ধে আমার আর কোন অভিযোগ নেই।

বিচারপতি এবার সুলতানকে লক্ষ্য করে বললেন, মহামান্য সুলতান! আদালত আপনাকে সসম্মানে মুক্তি দিচ্ছে। আপনি মুক্ত।

মুক্তির নির্দেশ পেয়ে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আসামীর কাঠগড়া থেকে নেমে এলেন। এরপর নিজের কাছে লুকিয়ে রাখা একখানি তরবারী বের করে বললেন–

কাযী সাহেব! আপনার ভাগ্য খুবই ভাল। এই দেখুন, আমি পোষাকের ভিতর লুকিয়ে এই তরবারীখানা নিয়ে এসেছিলাম। আজ যদি আমি বাদশাহ হওয়ার কারণে ন্যায় বিচারে কোনরূপ শিথিলতা কিংবা সামান্যতম পক্ষপাতিত্ব করতেন, তাহলে এ তরবারীর প্রচন্ড আঘাত আপনার গর্দান উড়িয়ে দিত।

সুলতানের কথা শেষ হওয়া মাত্রই ন্যায়বিচারক কাযী আপন আসনের নীচ থেকে একটি চাবুক বের করে বললেন, "মহামান্য সুলতান! আমিও আজ সিংহাসনের নীচে এ চাবুকটি লুকিয়ে রেখেছিলাম। আপনি যদি বাদশাহ হওয়ার কারণে দর্প ভরে আমার শরীয়ত সম্মত ন্যায় বিচার মেনে নিতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করতেন কিংবা এর প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা দেখাতেন তবে এ চাবুকের বিরামহীন আঘাত আপনার দেহকে রক্তাক্ত করে দিত। আল্লাহ পাকের শোকর যে, আপনি তেমনটি করেননি।"

বিচারপতির ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভীক আচরণে সুলতান খুব খুশি হলেন। তিনি দৌঁড়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, 'আপনার মত এমন ন্যায়পরায়ণ ও স্বাধীনচেতা সাহসী বিচারপতি পেয়ে সত্যি আমি গর্বিত ও আনন্দিত। মহান আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।"

জবাবে কাযী সাহেব বললেন, আমিও আপনার মত একজন প্রতাবশালী বাদশাহের মহানুভবতা, সহিষ্ণুতা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখে সীমাহীন আনন্দিত হয়েছি। সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি দেশে আজ আপনার মত শাসকেরই প্রয়োজন। দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন আপনাকে দীর্ঘজীবি করেন এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে সর্বোত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন।

প্রিয় পাঠক! আজকের পৃথিবীর দিকে দিকে যদি এমন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিচারক থাকতেন তবে তাবৎ বিশ্বের জনগণ কি শান্তির মুখ দেখতো না? অবশ্যই দেখতো। তাহলে চলুন, আজ থেকেই আমরা এ কথার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, তাদেরকেই আমরা আমাদের শাসক ও বিচারক নিযুক্ত করবো যারা হবেন সৎ, যোগ্য, নির্ভীক, ন্যায়পরায়ণ ও তাকওয়া-পরহেযগারীতে অদ্বিতীয়। যারা সর্বদাই প্রজাদের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনে আত্মনিয়োগ করবেন এবং নম্র-ভদ্র ও কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল বা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধিনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ তার পরিবার ও সংসারের জন্য দায়িত্বশীল। তাকে তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীলোক তার স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী। তাকে সে সম্পর্কে জওয়াব দিহি করতে হবে। খাদেম তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে তার সে দায়িত্ব পালন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। এক কথায়, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জওয়াবদিহি করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম শাসক যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদের ভালবাসে। তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। অপর দিকে তোমাদের মধ্যে মন্দ ও নিকৃষ্ট শাসক হচ্ছে তারা, যাদের তোমরা ঘৃনা কর এবং তারাও তোমাদের ঘৃনা করে। তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। (মুসলিম)

আল্লাহ পাক সকল শাসক বিচারক তথা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন। ❐

(সূত্র ঃ রিয়াযুজ সালাতীন পৃঃ ১৭০)

পতি প্রেমের এক বিরল দৃষ্টান্ত

দাম্পত্য জীবনকে সুখময়, শান্তিময় ও অনাবিল আনন্দে ভরপুর করে তোলার জন্য পতি ভক্তির গুরুত্ব অপরিহার্য। পতিভক্তি ব্যতীত সাংসারিক সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েশের প্রত্যাশা করা দুরাশা বৈ কিছুই নয়। নারী যতই প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারীনী হোক না কেন, যতই রুপবতী গুণবতী সতী সাধ্বী হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে হৃদয় গহীনে স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, মায়া-মমতা, হৃদ্যতা ও গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তিকে স্থান না দিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর জন্য নিজের যাবতীয় ধন-দৌলত, সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, আশা-আকাঙ্খা বিসর্জন দিয়ে স্বামীর দুঃখ-বেদনা, কষ্ট-ক্লেশ, দারিদ্রতা ও বিপদাপদকে স্বেচ্ছায় বরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার দাম্পত্য জীবন ও সংসার সুখময় হতে পারে না।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিপদ আপদের সম্মুখীন করেন। আল্লামা কারশী (র.) ছিলেন ঐ সকল আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের একজন যাকে আল্লাহ তাআলা কুষ্ট রোগ দিয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন। অবশ্য তিনি এ পরীক্ষায় সফলতার সাথে কৃতকার্যও হয়েছিলেন।

আরবীতে কুষ্ঠ রোগীকে মাজযুম বলা হয়। যেহেতু তিনি দীর্ঘ কাল যাবত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলেন তাই তার নামের সাথে মাযজুম শব্দটি যুক্ত করে তাকে আল্লামা কারশী মাজযুম (র.) বলা হত।

আল্লামা কারশী মাজযুম (র.) প্রথম জীবনে বিবাহ থেকে বিরত ছিলেন। এর কারণ এই ছিল যে, তিনি মনে করতেন, বিবাহের পর যে মেয়ে আমার স্ত্রী হয়ে ঘরে আসবে তার তো সীমাহীন কষ্ট হবে। তাছাড়া প্রতিটি মেয়ের অন্তরেই সুস্থ সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী স্বামী পাওয়ার তীব্র বাসনা চির জাগ্রত থাকে। আর এমনটি থাকাই স্বাভাবিক। আমি তো একজন অসুস্থ ব্যক্তি। কুষ্ঠ রোগে মারাত্মকভাবে

আক্রান্ত। সুতরাং আমি চাই না, আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাক।

কিন্তু তিনি ছিলেন একজন যৌবন প্রাপ্ত নওজোয়ান। ফলে স্বভাবতই তার মাঝেও বিবাহের মানসিক চাহিদা বিদ্যমান ছিল। এই চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং বিবাহ করা রাসূল (সা.) এর একটি সুন্নত বিধায় তিনি তার পূর্বের মত পরিবর্তন করলেন এবং বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর একদিন তিনি আপন মুরীদদের বললেন, আমি বিবাহ করার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং তোমরা আমার পক্ষ থেকে কোন দ্বীনদার মেয়ের অভিভাবকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাতে পার। তবে অবশ্যই মেয়ে ও মেয়ের অভিভাবকের নিকট আমার পূর্ণ অবস্থা বিস্তারিত বর্ণনা করবে। আমি যে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত তাও পরিস্কারভাবে বলে দিতে ভুল করবে না। আমার সার্বিক অবস্থা অবগত হওয়ার পরও যদি কোন মেয়ে আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী হয় তবেই আমি তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলব। অন্যথায় আমি ধৈর্য ধারণ করব। সবর করব। এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) যদি আমাকে কখনো জিজ্ঞেস করেন, হে কারশী! তুমি কেন আমার বিবাহের সুন্নতটি পালন করনি? তখন এর জবাব দেওয়াও আমার পক্ষে সহজ হবে।

একথা শুনার সাথে সাথে মজলিশে বসা এক মুরীদ দ্রুত উঠে বাড়ী চলে গেলেন। তার ছিলো যৌবনের ষোলকলা পরিপূর্ণ এক রুপবতী সুন্দরী ষোড়শী কন্যা। মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার জন্য তিনিও উপযুক্ত পাত্র খুঁজছিলেন। এবার পীর সাহেবের বিবাহের আগ্রহের কথা শুনে তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, মা! আমি তোমাকে আমার মুর্শিদ বিখ্যাত বুযুর্গ আল্লামা কারশীর হাতে তুলে দিতে চাই। তবে তিনি কুষ্ট রোগে আক্রান্ত একজন মাযুর মানুষ। এমতাবস্থায় তুমি রাজী থাকলেই কেবল এ বিয়ে হতে পারে। অন্যথায় নয়। আমি এ ব্যাপারে তোমার উপর চাপ সৃষ্টি করব না।

যেভাবে বইটি সাজানো

পিতার কথা শুনে মেয়ে খুবই খুশি হল। ভাবল, আমি যদি এ উসিলায় একজন আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গের খেদমত করার সুযোগ পাই তাহলে এটাই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। তাই সে পিতাকে বলল, আব্বু! আমি রাজি আছি।

মেয়ের সম্মতি পেয়ে ঐ মুরিদ পুনরায় তার শায়েখ হযরত কারশী (রহ.) এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হযরত! একটি দীনদার মেয়ে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছে।

ঃ মেয়েটি কে? শায়েখ জানতে চাইলেন।

ঃ মেয়েটি আমারই আদরের কন্যা।

ঃ তুমি কি আমার পূর্ণ অবস্থা তার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করেছ?

ঃ জ্বি হ্যাঁ! আমি সব কিছু খুলেই বলেছি। তাছাড়া আপনার সাথে আমার ইসলাহী সম্পর্ক থাকার সুবাদে সে আপনার অবস্থা আগে থেকেই জানে।

ঃ তুমি কি বলেছ যে, আমি মারাত্মক ব্যাধি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত?

ঃ জ্বি, বলেছি।

ঃ তার পরেও সে আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী হয়েছে?

ঃ জ্বি, হযরত। সবকিছু বিস্তারিত শুনার পরও সে সন্তুষ্ট চিত্তে রাজী হয়েছে। শুধু রাজীই নয়, বরং সে বলেছে, আপনার মত এত বড় একজন বুযুর্গের খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারলে সে কেবল খুশিই হবে না, নিজেকে ধন্যও মনে করবে।

মুরীদের কথা শুনে শায়েখ কারশী (রহ.) খুবই বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, এ মেয়ে তো নিশ্চয়ই দ্বীনদার পরহেজগার ও খোদা প্রেমিক মেয়ে হবে। না হয়, জেনে শুনে একটি কুষ্ট রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে কোন মেয়ে নিজকে এভাবে সপে দিতে পারে না। পিতার মুখে মেয়ের কথাবার্তা শুনে কারশী (রহ.) মেয়েটি সম্পর্কে যে ধারণা করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ ঠিক এবং বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি মিল। মেয়েটি যেমন কারশী (রহ.) কে চিনতে পেরেছিলেন, তেমনি কারশী (র.)ও মেয়েটিকে চিনতে ভুল করেননি। তাই উভয়ই সম্মত হওয়ার

পর দিনক্ষণ ধার্য করে ইসলামী শরীয়তের বিধান মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে বিবাহের কার্য সম্পাদিত হলো।

এবার সাক্ষাতের পালা। প্রিয়তম স্বামীকে প্রাণভরে দেখার ও খেদমত করার অদম্য আগ্রহ নিয়ে একটি নির্জন কক্ষে মেয়েটি বসে আছে। মনে মনে খোদার দরবারে ফরিয়াদ করে বলছে, হে খোদা! আমি যেন আমার কলিজার টুকরো স্বামীকে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ভালবাসা দিয়ে মনে প্রাণে খেদমত করে খুশি করতে পারি সে তৌফিক তুমি আমাকে দান কর। তিনি যেন আমার আচার আচরণ ও ব্যবহারের দ্বারা কখনো কষ্ট না পান সে তাওফীকও তুমি আমাকে নসীব করো।

এদিকে শায়েখ কারশী (রহ.)ও খোদার দরবারে এই বলে ফরিয়াদ জানালেন যে, আয় আল্লাহ ! তুমিতো দয়া পরবশ হয়ে আমার জন্য একটি দ্বীনদার স্ত্রীর ব্যবস্থা করেছ। তার মত মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে সত্যিই আমি যার পর নাই আনন্দিত। হে খোদা! সে একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে। মানুষ হিসেবে তারও জৈবিক চাহিদা আছে। কিন্তু আমি যে, কুষ্ঠ রোগী। এ রোগাক্রান্ত দেহ নিয়ে আমি কিভাবে তার সংস্পর্শে যাবে। কিভাবে তার সাথে মোলাকাত করব? হে পরওয়ার দিগার! এ রোগ তো তুমিই দিয়েছ। তা ইচ্ছা করলে এখনই তুমি ভাল করে দিতে পারো। এ রোগের কারণে আমি তোমার উপর মোটেও নাখোশ নই। তবে আমার স্ত্রী যেন যৌবনের আনন্দ উল্লাস থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য তোমার দরবারে আমি এ প্রার্থনা করছি যে, তার ঘরে প্রবেশ করার পূর্বেই তুমি আমার শারীরিক অবস্থা ভাল করে দাও এবং একজন সুন্দর ও সুদর্শন যুবকে পরিণত করে দাও।

মহান আল্লাহ তায়ালা দয়া করে হযরত কারশী (রহ.) এর আবেদন মঞ্জুর করে নিলেন।

প্রথম বাসর। জীবনের সবচেয়ে বড় স্মরণীয় আনন্দ রজনী। মনের মানুষটিকে লাভ করার শুভ মুহুর্তে। শাইখ কারশী (র.) ধীর পদে বাসর ঘরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু আল্লাহর কি কুদরত, ঘরে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্তে তার শরীরে কুষ্ঠ রোগের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রইল না। তিনি একজন সুন্দর স্বাস্থ্যবান বলিষ্ট যুবকে পরিণত হলেন।

কারশী (র.) ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে মেয়েটি তার দিকে এক নজর তাকাতেই দ্রুতপদে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে গেল। তারপর শায়েখ কারশী (র.) কে লক্ষ্য করে বললো-

ঃ আপনি কে? এখানে কেন এসেছেন?

ঃ কেন, তুমি আমাকে চেন না? আমি তোমার প্রিয়তম স্বামী কারশী।

ঃ না, আপনি আমার স্বামী নন। অনুগ্রহ করে আপনি এখান থেকে চলে যান।

এ জাতীয় পরিস্থিতির জন্য শায়েখ কারশী (রহ.) মোটেও মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলেন না । তাই তিনি কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন। তারপর মেয়েটিকে আরেকটু বুঝিয়ে বললেন, দেখ, তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না। আমি তোমার স্বামী। আজই তোমার পিতা আমার সাথে তোমার বিয়ে দিয়েছেন।

মেয়েটি এবারও বলল, আপনি আমার স্বামী নন। আপনার সাথে আমার বিয়েই হয়নি। যার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে তিনি তো কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। আপনি একজন সুস্থ সবল মানুষ। সুতরাং কি করে আপনি আমার স্বামী হলেন? আপনি তো কিছুতেই আমার স্বামী হতে পারেন না। তাই আবারও বলছি। দয়া করে আপনি এখান থেকে চলে যান।

শায়েখ কারশী (র.) সবকিছু পরিস্কার বুঝতে পারলেন। তিনি আপন স্ত্রীকে আশ্বস্ত কার জন্য তার দোয়া ও কারামতের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করে বললেন, এখন থেকে আমি যখনই তোমার কাছে আসব তখনই আমার আকৃতি এরূপ সুন্দর ও সুদর্শন হয়ে যাবে। তুমি কখনোই আমাকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে পাবে না।

শায়েখ কারশী (রহ.) এর কথা শুনে তার স্ত্রী এমন কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছিল যাতে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম মা বোনদের জন্য এক পরম শিক্ষনীয় ও উপদেশ গ্রহণের মত উপাদান রয়েছে। একটি মেয়ের ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা ও মন মানসিকতা কতটা উন্নত হতে

পারে, তার দীনদারী ও তাকওয়া পরহেজগারী কতটা উচ্চাঙ্গের হতে পারে- শায়েখ কারশী (র.) এর স্ত্রীর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে সহজেই তা অনুমান করা যায়।

মেয়েটি কারশী (রহ.) কে লক্ষ্য করে বলল, আমি দুনিয়ার ভোগ বিলাস আনন্দ ফুর্তি কিংবা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার জন্য আপনার বিবাহে আসিনি। বরং আমি তো এ আশা নিয়ে আপনার স্ত্রী হয়েছি যে, আপনার মত একজন উঁচু পর্যায়ের বুযুর্গ ও আল্লাহ ওয়ালার খেদমত করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করব। আপনার দেহের ক্ষতস্থানগুলো নিজের হাতে পরিস্কার করব। নিজের আচঁল দিয়ে আপনার পুঁজ রক্ত মুছে দিব। অবশেষে হাশরের ময়দানে খোদার সামনে দাঁড়িয়ে বলব, হে খোদা! আমি আমার প্রিয়তম স্বামীর হক আদায় করার জন্য হৃদয়ের পুঞ্জিভুত সমস্ত প্রেম-ভালবাসা দিয়ে আন্তরিকভাবে যথাসাধ্য খেদমত ও সেবা শশ্রুষা করার চেস্টা করেছি। অনুগ্রহপূর্বক এ উসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে আপনার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিন।

স্বামী আমার! যে মহান উদ্দেশ্যে আমি আপনার কাছে এসেছি সে উদ্দেশ্য তো এখন পূর্ণ হবে না। সুতরাং আপনি যদি আপনার আসল সুরত ও প্রকৃত অবস্থায় কুষ্ঠ রোগ সহ আমার সাথে মিলতে চান, তবেই আমি আপনার খেদমতের জন্য প্রস্তুত আছি। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে আমাকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দিন।

একথা শুনে শাইখ কারশী (রহ.) নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি মনে করেছিলেন, এমনটি হলে, তার স্ত্রী সীমাহীন খুশি হবে। আনন্দিত হবে। কিন্তু বাস্তবে হলো তার বিপরীত। তাই তিনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন, হে খোদা! যাকে খুশি করার জন্য আমি দোয়ার মাধ্যমে নিজের প্রকৃত অবস্থা পরিবর্তন করে নতুন রূপ ধারণ করেছিলাম, সে স্ত্রী যখন উহা পছন্দ করে না বরং সে আমার রোগাক্রান্ত দেহের খেদমত করে সৌভাগ্যবতীদের অন্তর্ভূক্ত হতে চায় সুতরাং তুমি মেহেরবাণী করে আমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দাও। সমস্ত দেহকে আগের মত কুষ্ঠ রোগে পূর্ণ করে দাও।

দোয়া শেষ করার সাথে সাথে আল্লাহ পাক শায়েখ কারশীকে (র.) পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তার সমস্ত দেহে আবার কুষ্ঠ রোগ এসে গেল।

কারশী (র.) এর স্ত্রী স্বামীকে প্রকৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলল, আমি তো এমনটিই চেয়েছিলাম। আমি এখন আমার মনের আশাকে পূর্ণ করতে পারবো। অতঃপর সে তার স্বামীর খেদমতে লেগে গেল এবং এ অবস্থাতেই তার সাথে ঘর সংসার করতে থাকলো। এক পর্যায়ে দেখা গেল, সুখ শান্তি আর অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল তাদের দাম্পত্য জীবন।

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ! দেখলেন তো, মেয়েটি কত বড় নেককার ও উন্নত চরিত্রের অধিকারীনী? প্রকৃতপক্ষে সে তার এ কর্মের মাধ্যমে তাবৎ বিশ্বের সমগ্র নারীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে শিখিয়ে গেল- স্বামীকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও খেদমত করতে হবে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্য দেখে নয়, ধন ঐশ্বর্য্য আর সহায় সম্পত্তির প্রাচুর্য্যের কারণে নয়, শিক্ষা দীক্ষা ও বংশ মর্যাদায় উঁচু হওয়ার জন্যও নয় বরং তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সেবা করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই। শরীয়তের বিধান হিসেবেই। অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্ত্রীকে এ কথা মনে করতে হবে যে, কেবল স্বামী হওয়ার কারণেই তিনি আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাকে হৃদয় দিয়ে আন্তরিকভাবে ভালবাসতে হবে, তার খেদমত করতে হবে কেবল স্বামী হওয়ার কারণেই। অন্য কোন গুণ বা কোয়ালিটি স্বামীর থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায়ই তিনি এগুলোর হকদার। আমার বিশ্বাস, এ কথা মনে করে কোন মেয়ে যদি তার স্বামীর ঘর সংসার করে, তাহলে তার জীবনে শান্তি আসবেই। সুখময় জীবন সে লাভ করবেই। আল্লাহ পাক সকল মা বোনদেরকে এ পরম সত্য ও বাস্তব কথাটি বুঝে তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন। ❒

(সূত্র ঃ জামে কারামাতিল আউলিয়া)

এভাবেই পরিবর্তন হোক আমার জীবন

বনী উমাইয়ার এক বিখ্যাত সরদার। মুসা বিন মুহাম্মদ নামেই সকলের নিকট পরিচিত। এই বিলাসী সরদার খানা-পিনা, খেল-তামাশা, নারীসঙ্গ আর নাচ-গান নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত থাকতো। আনন্দ উল্লাস আর রং-তামাশার জন্য যত কিছুর প্রয়োজন, তার সবই তার নিকট সর্বদা মওজুদ থাকতো। এতে বৈধ অবৈধের কোন পরওয়াই সে করতো না। এক কথায়, ভোগ-বিলাস ছাড়া তার জীবনে যেন আর কোন কাজ ছিল না। অগাধ ধন-সম্পদের মালিক এই সরদারের রূপ যৌবনও ছিল অসামান্য। তার চেহারা ছিল পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। ফলে প্রথম দর্শনেই সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তার বার্ষিক আয় ছিল তিন লক্ষ তিন হাজার দীনার। এই বিশাল আয়ের সবটাই সে আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার পিছনে ব্যয় করে ফেলতো।

তার সুরম্য প্রাসাদটি ছিল স্থাপত্য শিল্পের মূর্ত প্রতীক। সকাল-বিকাল প্রাসাদের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে পথচারি নারী-পুরুষদের আনাগোনা অবলোকন করতো। প্রাসাদের পিছনে ছিল একটি ফুলের বাগান। সে দিকের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে রকমারি ফুলের সুঘ্রাণ ও স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করতো। প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিল একটি চিত্তাকর্ষক গম্বুজ। স্বর্ণ ও রুপার কারুকার্যে সুশোভিত ঐ গম্বুজের মধ্যভাগে ছিল একটি সুদর্শন সিংহাসন। সে মাঝে মাঝে মহামূল্যবান রাজকীয় পোষাকে সজ্জিত হয়ে এতে আসন গ্রহণ করতো। ডানে বামে বন্ধু-বান্ধব ও পিছনে চাকর নওকরদের স্ব স্ব স্থানে নিযুক্ত করে রং তামাশার আসর জমাতো।

সিংহাসনের সামনে অনতিদূরে ছিল একটি ঝুলন্ত পর্দা। পর্দা সরালেই দেখা যেত একদল সুন্দরী ষোড়শী অর্ধনগ্না নর্তকী। যৌন আবেদনময়ী বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে তারা সারিবদ্ধ ভাবে দন্ডায়মান। সরদারের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তারা মজলিশ সরগরম করে নাচগানের ঝড় তুলতো। গভীর রাত পর্যন্ত এই আসর চলার পর

সকলে যার যার ঘরে চলে যেত। আর সরদার নিজের পছন্দসই কোন রূপসী নর্তকীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের খাস কামরায় রাত্রি যাপন করতো। পরদিন আবার শুরু হতো আনন্দ উল্লাসের নতুন কার্যক্রম। এভাবেই চলতে থাকে অপরিণামদর্শী সর্দারের আয়েশী জীবন।

একদিনের ঘটনা। সরদার রং মহলে নাচ গান ও মদমত্ত হয়ে বুঁদ হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে একটি করুণ সুর তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে অন্তরে গিয়ে আঘাত হানল। সেই সুরে কি যে ছিল, উহা শুনিবা মাত্র তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সমস্ত হৃদয় জুড়ে শুরু হল মহা তোলপাড়। সে নাচগান বন্ধ করে দিল। ভীষণ মনোযোগী হল সেই মন মাতানো করুণ সুরের প্রতি। সে দেখলো, থেমে থেমে সেই সুর করুণ আর্তনাদের স্পন্দন তুলে গোটা পরিবেশটাকেই যেন বেদনার্ত করে তুলছে।

সরদার তন্ময় হয়ে সেই সুর লহরীর স্বাদ আস্বাদন করছে। তার হৃদয় বীনায় বারবার সেই সুর ঝংকার তুলছে। সুরের মুর্ছনায় সে এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছে যে, সে যেন এ বাস্তব পৃথিবীতে নেই। যেন চলে গেছে দূরে, বহু দূরে। অন্য এক জগতে।

সরদারের এ অপ্রত্যাশিত ভাব প্রত্যক্ষ করে পার্শ্ববর্তী বন্ধু-বান্ধব ও চাকররাও চরম বিস্ময়বোধ করছে। তারা ভাবছে, য়িনি সরদার রাতদিন নাচগান আর মদ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, নারীর সাহচর্যই যার জীবনের প্রধান কাজ, তার আজ কি হল? কেন তিনি এমন করছেন? কেন তিনি হঠাৎ নাচ গান বন্ধ করে দিয়ে সুন্দরী নর্তকীদের দূরে সরিয়ে তন্ময় হয়ে আছে।

তারা এসব চিন্তা করছিল। হঠাৎ সরদারের আওয়াজে সম্বিত ফিরে পেল। সর্দার কড়া নির্দেশ দিয়ে বললো, যাও, ঐ সুর অনুসরণ করে সামনে এগিয়ে দেখ, কোন সে ভাগ্যবান এই করুণ সুর তুলেছে। তার সুর লহরীতে আমি যে ব্যাকুল বেকারার হয়ে যাচ্ছি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি না। যাও, দ্রুত গমন করে তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো।

সরদারের নির্দেশে বেরিয়ে পড়ল সকলই। উদ্দেশ্য, সেই

সুরকারকে খুঁজে বের করা যার সুরের মুর্ছনায় সরদার আজ পাগল পারা। যার সুরের করুণ আহবান বারবার সরদারের হৃদয় মনে প্রলয়ংকরী ঝড় তুলেছে।

ঘটনাস্থলে তারা গিয়ে দেখলো, শীর্ণদেহী এক যুবক মসজিদে দাঁড়িয়ে করুণ সুরে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছে। তার বিবর্ণ দেহে গোশত নেই বললেই চলে। মাথার চুল এলোমেলো। চোখগুলো কুঠুরীর ভিতর চলে গেছে। গায়ে দুখন্ড কাপড় জড়িয়ে মিনতির ভঙ্গিতে পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এ জগতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। যেন দূরের, বহুদুরের কোন প্রেমাস্পদের সাথে গোপন প্রেমালাপে মগ্ন আছে। বস্তু জগতের প্রতি তার কোন খেয়ালই নেই।

এভাবে দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হল। একসময় তার তিলাওয়াত বন্ধ হলে লোকজন তাকে সরদারের দরবারে হাজির করলো।

সরদার যুবককে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী পাঠ করছিলে? যুবক বললো, আমি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলাম। সরদার উহা শুনতে চাইলে যুবক সূরায়ে মুতাফফিফীনের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালো। যার অর্থ নিম্নরূপ ঃ

“নিশ্চয়ই সৎলোকগণ থাকবে অত্যন্ত আরামে। তারা সিংহাসনে বসে (বেহেশতের আরামদায়ক ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী) অবলোকন করবে। আপনি তাদের মুখ মন্ডলে স্বাচ্ছন্দের সজীবতা দেখতে পাবেন। তাদেরকে মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ শরাব পান করানো হবে। যাতে কস্তুরীর সীল মোহর থাকবে। আর এরূপ বস্তুর প্রতিই লালসাকারীদের লালসা করা উচিত। এর মিশ্রণ হবে তাসনীম (নামক ঝরনার) পানি। এটা এমন এক ঝরনা যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।” (সূরা মুতাফফিফীন ঃ ২২-২৮)

তেলাওয়াত শেষে যুবক আয়াতগুলোর তরজমা করল। তারপর বললো-

হে সরদার! তুমি দুনিয়ার ধোকায় পড়ে আছ। তোমার এ বালাখানা ও বিলাস উপকরণের সঙ্গে বেহেশতের নাজ নেয়ামতের কোন তুলনা হতে পারে না। বেহেশতবাসীদের চক্ষুর শীতলতার জন্য

এমন সব নেয়ামতের ব্যবস্থা করা আছে যেগুলো কোন চক্ষু কোনদিন দর্শন করেনি, কোন কর্ণ কোনদিন শ্রবণ করেনি এবং কোন অন্তর সেগুলোর কথা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। তাদের জন্য সবুজ রংয়ের অপূর্ব রেশমী পোষাক, নরম কোমল গালিচা, সুশোভিত বাগান ও নহর, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট অসংখ্য ফলমূলের ব্যবস্থা রয়েছে। এসব নেয়ামত তারা ইচ্ছামত ভোগ করবে। কেউ কোনদিন তাদের বাধা দিবে না। তাদের জন্য সেখানে রয়েছে এমন সব আয়াতলোচনা সুন্দরী-রূপসী হুর, যাদের একটি কনিষ্ঠা আঙ্গুলের উজ্জলতার সামনে সূর্যের আলো পর্যন্ত ম্লান হয়ে যাবে। তাদের প্রত্যেককে দেয়া হবে দুধ, মধু পবিত্র শরাব ও মিঠা পানির চারটি নদী। এগুলো তারা যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা প্রবাহিত করতে পারবে। তাদের মনের কোন আশাই সেদিন অপূর্ণ রাখা হবে না। সেখানে তারা তাদের মহান প্রভূ আল্লাহ তাআলাকেও স্বচক্ষে দেখতে পারবে। যেমন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা অতি শীঘ্রই তোমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহকে দেখতে পাবে। যেমন দেখতে পাও চৌদ্দদিনের আলোকোজ্জ্বল চন্দ্রকে।

সেখান থেকে তাদেরকে কখনো বের করা হবে না। অনন্ত অসীম কাল ধরে তারা সেখানে আমোদ-স্ফুর্তি, আনন্দ-উল্লাস ও সুখময় জীবন যাপন করতে থাকবে।

পক্ষান্তরে কাফের ও গোনাহগারদের জন্য সেখানে ভয়াবহ আগুনের লেলিহান শিখা অপেক্ষা করছে। সেই আগুনের তাপ দিন দিন আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

“তারা যখনই সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা ঐ জাহান্নামের শাস্তি ভোগ কর যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।” (সুরা সিজদাহ)

মোট কথা খোদার বিধান অমান্য করে যারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত থাকবে, এসব শাস্তির ব্যবস্থা কেবল তাদের জন্যই বরাদ্দ।

যুবকের কথাগুলো সর্দারের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। মুহূর্তে গোটা দুনিয়া তার সামনে অন্ধকার হয়ে এলো। ভাবল, হায়! সারাটি জীবন আমি কি করলাম। পৃথিবীতে এমন কোন পাপ নেই যা

আমি করিনি। আমার সামনে তো বিরাট এক জিন্দেগী আছে। হাশরের ময়দানে খোদার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে গোটা জীবনের হিসাব দিতে হবে। আমি তো মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কিছুই করিনি। ভোগ বিলাস আর আরাম আয়েশের মধ্যেই সারাটি জীবন কাটিয়ে দিলাম। হায়! আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সামনে আমি কি জবাব দিব। হায়, পরকালে আমার অবস্থা কি দাঁড়াবে।

এসব কথা চিন্তা করতে করতে তার নয়নগুলো অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। ফোঁপানো কান্নার সকরুণ সুর আর বাধভাঙ্গা অশ্রু কাপড়ে মুছে দু হাত দিয়ে যুবককে জাড়িয়ে ধরে বললো, ভাই! সত্যিই আমি জীবনের মহামূল্যবান সময়গুলো আল্লাহর নাফরমানি ও অবহেলায় নষ্ট করেছি। আমার মত হতভাগা বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তবে আমি তোমার প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞ যে, তোমার নসীহত আমার জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছে। তুমিই আমাকে আলোর পথ দেখিয়েছ। সত্যের পথ প্রর্দশন করেছ। তোমার ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো না।

এভাবে সরদার আরও কিছুক্ষণ অনুশোচনা ও আক্ষেপ করলো। তারপর চাকর-নওকর, গোলাম-বাদী সকলকে বিদায় করে দিল। ঘরের যাবতীয় বিলাস সামগ্রী খাট-পালংক, মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছেদ, স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি বিক্রয় করে গরীব মিছকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিল।

এবার সে প্রকাশ্য গোনাহের জন্য প্রকাশ্যে এবং গোপনীয় গোনাহের জন্য গোপনে তওবা করল। যে সকল মানুষের হক নষ্ট করেছিল তাও সে কড়ায় গন্ডায় হিসেব করে আদায় করল। তারপর মসজিদে গিয়ে দিবা রাত্র আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হল এবং দুটি মোটা কাপড় ও যবের রুটির উপর দিন গুজরান করতে লাগলো।

এভাবে চলতে চলতে এক সময় তিনি ইবাদত বন্দেগীতে এতটাই নিমগ্ন হয়ে পড়লেন যে, দিনভর রোজা ও রাতভর জিকির, তিলাওয়াত ও নামাজের মধ্যে কাটিয়ে দিতে লাগলেন।

সরদার পূর্ব থেকেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে এই পরিবর্তনের ফলে সর্বত্র তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে তার নিকট

দীনদার, নেককার ও আল্লাহ ওয়ালাদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। একদিন কোন এক আল্লাহ ওয়ালা তাকে বললেন, ভাই! আল্লাহ পাক তো বান্দার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। আপনি তো নফ্সকে অনেক কষ্ট দিচ্ছেন। আমার মনে হয় স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার যত্ন নেয়া উচিত।

জবাবে তিনি বললেন, ভাই সারাটা জীবন আমি আল্লাহর নাফরমানিতে কাটিয়েছি। ভোগ বিলাস আর আরাম আয়েশে মত্ত রয়েছি। দীর্ঘ সাতাইশ বছর এই দেহ কম মজা উপভোগ করে নাই। কম মুখরোচক ও সুস্বাদু খাবার খায় নাই। কম মূল্যবান রাজকীয় পোষক ব্যবহার করে নাই। সুতরাং এগুলোর ক্ষতিপূরণের জন্য কি আমার ......। এতটুকু বলে তিনি অজস্র ধারায় ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শেষ জীবনে এই বুযুর্গ দুটি মোটা কাপড় দেহে জড়িয়ে একটি থালা ও একটি বাটি নিয়ে পদব্রজে হজ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হন। দীর্ঘ দিনের বিরামহীন সফরের পর একদিন তিনি মক্কায় এসে উপস্থিত হলেন এবং হজ্জ আদায়ের পর সেখানেই ইন্তেকাল করেন। মক্কায় থাকাকালে তার অবস্থা এই ছিল যে, রাতের বেলা হাজরে আসওয়াদের নিকট দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসিযে দিতেন এবং বিগত জীবনের অপরাধ ও ত্রুটি সমূহের উল্লেখ করে আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করে বলতেন-

আয় পরওয়ার দিগার! সারাটি জীবন আমি তোমার নাফরমানী ও গাফলতের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছি। জীবনের যাবতীয় সম্পদ ও সুযোগ তোমার হুকুমের খেলাফ ব্যয় করেছি। তোমাকে দেখানোর মত কোন আমল আমার নিকট নেই। তোমার অনুগ্রহ আর দয়াই আমার একমাত্র ভরসা। হে খোদা! তোমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করার যোগ্যতা আমার নেই। তোমার নিকট আমার মিনতি শুধু এতটুকু যে, তোমার রহমতের দরিয়ার কিনারায় আমি অধমকে সামান্য ঠাই দিও। আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিও। নিঃসন্দেহে তুমি মহাক্ষমাশীল।

প্রিয় পাঠক! বর্তমানে আমাদের সমাজে কি এমন লোকের অভাব

আছে যারা খোদায়ী বিধান লংঘন করে বিভিন্ন অশ্লীল অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে? যারা পরকালকে ভুলে গিয়ে কেবল দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগী নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে? যারা দুনিয়ার জীবনকেই আচ্ছামত ভোগ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিলাসী সামগ্রী যোগাড় করছে?

এসকল প্রশ্নের জবাবে আমাদেরকে ইতিবাচক সাড়াই দিতে হবে। না বলার কোন জো নেই।

এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, আমরা যারা আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত হয়েছি, প্রতিটি মূহুর্তে আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকামকে অমান্য করে গড্ডালিকা প্রবাহে জীবন চালিয়ে দিচ্ছি, টিভি ভিসিআর থেকে শুরু করে ডিস এন্টিনা সংযোগ দেয়ার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, তারা কি একটি বারের জন্যও চিন্তা করে দেখেছি যে, আমাকে একদিন মরতে হবে। যে খোদার বিধান আমি অহরহ লংঘন করে চলেছি সেই খোদার কাছে আমাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। হিসেব দিতে হবে সারাটি জীবনের। হিসেব দিতে হবে যৌবন কালের। হিসেব দিতে হবে- মাল কিভাবে সংগ্রহ করেছি এবং কোথায় তা খরচ করেছি। আমি কি চিন্তা করেছি যে, আমাকে একদিন নির্জন কবরে একাকী শুইতে হবে। ফেরেশতাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পারলে সেখানেও আমাকে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে। এমন জোরে চাপ দেয়া হবে যে, এক পাজরের হাড়গুলো অন্য পাজরে ঢুকে যাবে। সেখানে নিযুক্ত করা হবে এমন এক সাপ যার নখগুলো হবে লোহার, চোখগুলো হবে আগুনের মত, এতবড় দীর্ঘ হবে যে, একদিনের রাস্তা অপেক্ষা বড়। তার আওয়াজ হবে বজ্রের মতো। সে একের পর এক দংশন করতে থাকবে। সাপটি একবার দংশন করলে লোকটি ৭০ হাত মাটির নীচে চলে যাবে। কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে সে আযাবে গ্রেফতার থাকবে।

আমার কি চিন্তা করা উচিত নয় যে, যদি আমি খোদার নাফরমানী করার কারণে জাহান্নাম বাসী হই তাহলে আমার কি অবস্থা দাঁড়াবে। আমাকে তো সেখানে এমন বিকট হাতুরী দ্বারা পেটানো হবে, যে

হাতুরীকে সমস্ত জ্বীন ইনসান মিলেও উঠাতে পরবে না। আমাকে তো এমন পূঁতি দূর্গন্ধময় পুঁজ পান করানো হবে যার এক বালতি দুনিয়ার পশ্চিম প্রান্তে ঢেলে দিলে পূর্ব প্রান্তের মানুষগুলো অসহনীয় দুর্গন্ধের কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আমাকে তো সেদিন পান করানো হবে এমন তীব্র গরম পানি যা চেহারার সামনে আনার সাথে সাথে চেহারার গোশতগুলি খসে নীচে পড়ে যাবে। সুতরাং ভাইগণ! দেরী করার আর সময় নেই। মৃত্যু যেকোন সময় আপনার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে। স্তব্দ করে দিতে পারে আপনার আনন্দ উল্লাস আর রং তামাশার জীবন। তাই অধমের পক্ষ থেকে বিনীত অনুরোধ, তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসুন। শান্তির ধর্ম ইসলামকে জানুন। জানতে চেষ্টা করুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ুন। যাবতীয় পাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি সুন্নতকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করুন। খোদার জমীনে খোদায়ী বিধানকে প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হোন। টিভি ভিসিআর ঘর থেকে বের করুন। ছেলে মেয়েদেরকে প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিন। মেয়েরা বড় হলে তাদেরকে পর্দায় রাখার ব্যবস্থা করুন। নিয়মিত কুরআনে পাক তিলাওয়াত করুন। সকাল সন্ধ্যায় জিকির করুন। হালাল উপায়ে উপার্জন করুন। যে কোন দ্বীনি বিষয় জানার জন্য হক্কানী আলেমদের শরনাপন্ন হোন।

মনে রাখবেন, আপনি যদি সত্যিকার অর্থেই দ্বীনদার হতে পারেন তাহলে দেখবেন, দুনিয়াতেই আপনি লাভ করবেন স্বর্গীয় সুখ। এক পরম প্রশান্তি সর্বদা আপনার হৃদয়-রাজ্যে বিরাজ করতে থাকবে। কঠিন সমস্যায় পতিত হলেও আল্লাহ পাক আপনাকে সে সমস্যা থেকে উত্তরণ হওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন। উপরন্ত তিনি এমন জায়গা থেকে আপনার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন যেখান থেকে রিযিক আসবে বলে আপনি ধারণাও করতে পারেননি। এটা আমার বানানো কথা নয়। এ কথা আল্লাহ তাআলা নিজেই পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন।

"যে ব্যক্তি পরহেজগারী এখতিয়ার করবে আল্লাহ তাআলা

যেভাবে বইটি সাজানো

(পুরস্কার স্বরূপ) তার সমস্যা সমাধানের যাবতীয় রাস্তা খুলে দিবেন এবং তার ধারণার অতীত জায়গা থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।”

সম্মানিত পাঠক, উপরের কথাগুলো আমি হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ও দরদ দিয়েই লিপিবদ্ধ করেছি। আমার বিশ্বাস, উল্লেখিত ঘটনা ও আমার প্রাসঙ্গিক কথাগুলো আপনাদের হৃদয়ে এক চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করবে এবং আখেরাতের তৈরীর ব্যাপারে যত্নবান হতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। আল্লাহপাক আমাদের তাওফীক দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন। ❐

(সূত্র ঃ নুযহাতুল বাসাতীন)

একটি ভয়ংকর ঘটনাঃ সতর্ক হওয়ার এখনই সময়

মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এটি মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এর ভাষা যেমন স্বচ্ছ তেমনি বাক্য বিন্যাসও অত্যন্ত নিখুঁত, নির্ভুল ও অভিনব। বিরুদ্ধবাদীরা চ্যালেঞ্জ করেও কুরআনের ঐশী গ্রন্থ হওয়ার অকাট্যতা ভুল প্রমানে ব্যর্থ হয়েছে। আরবী ভাষায় যারা পন্ডিত ছিলেন, তারা অনেক চেষ্টা করেও কুরআন সম্পর্কে এতটুকু ভুল বের করতে পারেনি।

কুরআনের সূরা, আয়াত, অক্ষর, রুকু, পারা ইত্যাদির মধ্যে যে সুস্পষ্ট মিল বর্তমান, এটাও তার ঐশী গ্রন্থ হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। তাই কুরআন হচ্ছে সর্বকালের, সর্বযুগের, সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় গ্রন্থ। কুরাআনের প্রাঞ্জল ভাষায় মুগ্ধ হয়ে প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পন্ডিত স্যার ডারমন্ড বার্ম লিখেছেন, “কুরআনের বিধানাবলী শাহানশাহ থেকে শুরু করে পর্ণ কুটীরের অধিবাসী পর্যন্ত সকলের জন্যই সমান উপযোগী ও কল্যাণকর। দুনিয়ার অন্য কোন ব্যবস্থায় এর বিকল্প খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।”

এ প্রসঙ্গে ডাঃ মসওয়েল বলেন, “কুরআনের প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধান এতই কার্যকরী ও সর্বকালের জন্য উপযোগী যে, তা সর্বযুগের দাবী পূরণ

করতে সক্ষম। কর্ম কোলাহলপূর্ণ নগরী, মুখর জনপদ, শূণ্য মরুভূমি এবং দেশ হতে দেশান্তরের সব জায়গায়ই এ বাণী সমভাবে ধ্বণিত প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায়।"

বস্তুত কুরআন এমন এক ঐশী গ্রন্থ যাতে নাযিল হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কোন প্রকার বিকৃতি ঘটেনি। ঘটবেও না। ঘটার সম্ভাবনাও নেই। কেননা এর হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক গ্রহণ করেছেন। যারা কুরআনের সাথে বেয়াদবী করেছে, কুরআনকে নিশ্চিহ্ন কিংবা বিকৃত করার ঘৃন্য অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে তাদের সে অপচেষ্টা কেবল ব্যর্থই হয়নি বরং কখনো কখনো তাদের উপর নেমে এসেছে ভয়ানক খোদায়ী গজব। নিম্নে এ সংক্রান্ত একটি সত্য ঘটনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

সাগর পারে অবস্থিত তুরস্কের একটি বিখ্যাত নৌঘাঁটি। একটি জাক জমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য আজ কদিন যাবত সেখানে বেশ তোড়জোড় চলছে। অবসর প্রাপ্ত কয়েকজন তুর্কী জেনারেলের সংবর্ধনা উপলক্ষেই এই বিশেষ আয়োজন। এই অনুষ্ঠানের নাম দেয়া হয়েছে Mad nigth festitvale বা "উন্মুক্ত রজনী উৎসব"। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছেন আমেরিকা, ইসরাঈল ও স্বাগতিক দেশ তুরস্কের প্রায় নব্বই জনেরও বেশী কর্নেল, জেনারেল ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। অনুষ্ঠানের শ্রী বৃদ্ধি এবং এতে যোগদানকারী লোকদের সীমাহীন পর্যায়ের চিত্তরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে ইহুদী খৃষ্টান ও ধর্মনিরপেক্ষ উচ্ছল, যৌন আবেদনময়ী সুন্দরী নর্তকীদের। আর লেটেস্ট মডেলের বিভিন্ন প্রকার মদের ব্যবস্থা তো আছেই।

যথাসময়ে শুরু হল মদ্যপান আর উদ্দম নৃত্য। জেনারেলদের ঘিরে নাচছে নর্তকীরা। বাজছে মিউজিয়াম। সুন্দরী নর্তকীদের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী পুলকিত শিহরণ জাগিয়ে তুলছে দর্শকদের হৃদয়ে। চলছে মদের সয়লাব।

উন্মুক্ত রজনীর উন্মত্ততা তখন তুঙ্গে। সুরার নেশায় সকলেই তখন উম্মাদ। হর্ষ ধ্বণি আর করতালিতে বিশাল হল রুম যেন ফেটে পড়ার উপক্রম। ঠিক এই সময় অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক ধর্মদ্রোহী

যেভাবে বইটি সাজানো

জেনারেলের মাথায় এলো এক শয়তানী পরিকল্পনা। মদের নেশায় বুঁদ হয়ে চিৎকার দিয়ে ডাকলেন এক ক্যাপ্টেনকে। আনতে বললেন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন।

ধর্মপ্রাণ ক্যাপ্টেন জেনারেলের কথা শুনে শিউরে উঠলেন। এই নোংড়া পরিবেশে পবিত্র কুরআন দিয়ে তিনি কি করবেন, এই চিন্তায় তার সমস্ত দেহের লোমগুলো একত্রে খাড়া হয়ে গেল। তবু উপায় নেই জেনারেলের হুকুম অমান্য করার। পবিত্র কুরআন উপস্থিত করা হলো।

জেনারেল চোখ লাল করে হিংস্র হায়েনার রূপ ধারণ করলেন। উন্মুক্ত রজনীর উন্মত্ততা তাকে আজ ভাল করেই পেয়ে বসেছে। তিনি ক্যাপ্টেনকে লক্ষ্য করে জলদ গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন-

ঃ ক্যাপ্টেন! খোল তোমার কুরআন। পাঠ কর ১৪ পারার সূরা হিজরের ৯ নং আয়াত।

ঃ কেন, কি উদ্দেশ্য এই নির্দেশ, একটু জানতে পারি স্যার? ক্যাপ্টেন ভয়ে ভয়ে বললেন।

ঃ একটু পরেই তুমি জানতে পারবে। তোমাকে যা বলছি তা কর। মনে রেখো আমি এক নির্দেশ দু'বার দেই না, ক্যাপ্টেন।

নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন পবিত্র কুরআন শরীফ খুলে পাঠ করলেন

"ইন্না নাহনু নায্যালনাজ্জিকরা ওয়াইন্না লাহূ লা হাফিজুন" আমিই (আল্লাহ) কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমিই এর হেফাজতকারী।

আয়াত পাঠ শেষ হলে জেনারেলের দ্বিতীয় নির্দেশ এলো-

ঃ ব্যাখ্যা কর এই আয়াতের।

ঃ আমি জানি না এর ব্যাখ্যা। শংকিত ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন।

ঃ ব্যাখ্যা জান না? এত দিন কি করলে তুমি। শুন! আমার মুখ থেকেই শুন এই আয়াতের ব্যাখ্যা। একটি ব্যাঙ্গাত্মক হাসি ফুটে উঠলো জেনারেলের মুখে।

ঃ জি, বলুন জনাব।

ঃ এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে তোদের আল্লাহ বলছে আল্লাহ নাকি নাযিল করেছে এই কিতাব আর সে নিজেই নাকি রক্ষা করবে এই কুরআনকে। একথা বলে হো হো করে হেসে উঠলো জেনারেল।

জেনারেলের ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা-বার্তায় ক্যাপ্টেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। মুহূর্তে গোটা দুনিয়া তার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে এলো। তার চোখে মুখে উদ্বেগ-উৎকন্ঠা।

আয়াতের অবমাননাকর ব্যাখ্যা করেই জেনারেল ক্ষান্ত হননি। এতটুকুর পরেই তিনি পবিত্র কুরআনকে ক্যাপ্টেনের হাতে ফেরত দেননি। বরং সেদিন তিনি পবিত্র কুরআনের সাথে যে জঘন্যতম বর্বর আচরণ করেছিলেন তা শুনলে যে কোন মানুষ আঁতকে উঠে বলতে বাধ্য হবে, মানুষকি এতটা ইতর, অভদ্র ও নিষ্ঠুর হতে পারে? পারে কি একটি ঐশী গ্রন্থের সাথে এমন অবমাননাকর নির্মম আচরণ করতে?

হ্যাঁ, মানবরূপী এ হায়েনা জেনারেলের পক্ষে সে কাজটাই সেদিন সম্ভব হয়েছিল। সে বিদ্রুপাত্মক অট্টহাসির সঙ্গে তার নিষ্ঠুর হাতের ছোয়ায় পবিত্র কুরআনের সবগুলো পাতাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো। অতঃপর তা বড়ই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছড়িয়ে দিল মদের আসরে নৃত্যরত উলঙ্গ নর্তকীদের পায়ের তলায়। তারপর দম্ভভরে বারবার চিৎকার করে বলতে লাগলো-

কোথায় সে কুরআন নাযিলকারী আর কোথায় এর হেফাজতকারী? ক্যাপ্টেন! কোথায় তোমার আল্লাহ। কুরআনকে হেফাজত করার জন্য কেউ তো এগিয়ে এলো না। সুতরাং এই আয়াত মিথ্যা নয় কি?

জেনারেলের পৈশাচিক উন্মত্ত আচরণে ক্যাপ্টেনের গলা রুদ্ধ হয়ে এলো। তার চোখের কোণে দেখা গেল উপচানো অশ্রুধারা। ছোট শিশুটির মতো মুখ গুজে কিছুক্ষণ কাঁদলেন তিনি। মনে মনে বললেন, যে শংকা আগে ভাগেই করেছিলাম শেষ নাগাদ সেটাই ঘটলো। ওহ্! কি অপ্রীতিকর দৃশ্যই দেখতে হলো আমাকে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে তার চৈতন্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম হলো।

জেনারেলের আরেকটি অট্টহাসিতে তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। সে আবারও দাম্ভিকতার স্বরে বললো, ক্যাপ্টেন! কুরআনকে রক্ষার জন্য তোমার আল্লাহ যে এলো না! কোথায় গেল তোমার আল্লাহ!!

এবার ক্যাপ্টেনের ভিতর চূড়ান্ত পর্যায়ের ভয় ঢুকে গেল। তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, এই হলরুম এখন খোদায়ী গজবে নিপতিত হবেই। এরূপ অন্যায় অপকর্ম অবশ্যই আল্লাহ তাআলা বরদাশ্ত করবেন না। তাই তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার দিতে দিতে হলরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন দ্রুত পরিত্যাগ করলেন ঘাঁটি।

খোদায়ী গজব বোধ হয় এই ধর্মভীরু মুসলিম ক্যাপ্টেনের খাতিরেই কিছুটা বিলম্বিত হয়েছিল। যখন তিনি ঘাঁটি ত্যাগ করলেন তখনই পবিত্র কুরআন অবমাননাকারীদের সমুচিত শাস্তি দেয়ার জন্য শুরু হল খোদায়ী গযব। প্রথমেই কক্ষের দেয়াল বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলো প্রচন্ড এক অগ্নিস্তম্ভ। কমলা রংয়ের প্রবল আলোর বিচ্ছুরণে ধাঁধায়ে গেল সকলের চোখ। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ এক মহাশব্দ, মহানাদ। ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই তখন হতভম্ব। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সকলেই দাঁড়িয়ে। ছুটে পালাবার শক্তিও যেন তাদের দেহ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। সবকিছু ঘটে যাচ্ছে নিমিষের মধ্যেই। তারা দেখল, বিকট আওয়াজ আর প্রচন্ড ভুমিকম্প হল রুমের সবকিছুকে লন্ডভন্ড করে দিয়ে এক সময় সবাইকে নিয়ে চিরদিনের জন্য মাটির নীচে দেবে গেল। বিলীন হয়ে গেল মৃত্তিকা গর্ভে। কারো চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট রইল না। পাশাপাশি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল আশে পাশের অন্যান্য এলাকাও। শেষ পর্যন্ত হিসেব করে দেখা গেল ৫০ হাজারের ও বেশী বনী আদম নিহত হল। হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

শ্রদ্ধেয় ভাই ও বোনেরা! শিক্ষা গ্রহণের জন্য এই একটি ঘটনা যথেষ্ট নয় কি? আমার তো মনে হয়, কারো যদি মরণঘুম না হয় তাহলে তার জন্য এই একটি মাত্র সতর্ক সংকেতই যথেষ্ঠ।

সুতরাং আসুন। পবিত্র কুরআন পড়ুন। অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন। শাহজালাল, শাহ পরান, শাহ মাখদুম ও খান জাহান আলী (রহ.) এর ন্যায় হাজারো পীর আউলিয়ার এই দেশে বার কোটি মুসলমানের পূণ্যভূমিতে ইসলামকে বিসর্জন দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা, ধর্মদ্রোহীতা ও ধর্মহীনতা প্রতিষ্ঠার অশুভ তৎপরতায় মেতে উঠবেন না।

আপনারা যারা পৌত্তলিকতার সয়লাবে দেশ ভাসিয়ে দিতে চান, মূর্তিকালচার, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার আবর্তে দেশকে নিমজ্জিত করতে চান, যারা পবিত্র কুরআন ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নাস্তিক মুরতাদদের কাছ থেকে বাহবা কুড়াতে চান, যারা শক্তি ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এসব পাপাচার, কামাচার ও জুলুমের বিপক্ষে অবস্থান নেননি, প্রতিকার করেননি, প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি, তারা সাবধান হোন, সতর্ক হোন, তওবা করুন, পথে ফিরে আসুন। ফিরে আসার এটাই উপযুক্ত সময়। আল্লাহর ক্রোধকে উদ্দীপিত করবেন না। তার ধৈর্যের দেয়ালে আঘাত হানা থেকে বিরত থাকুন। একবার যদি সে দেয়াল ধ্বসে যায়, আর তুরস্কের ন্যায় মহাগজবের সয়লাব আপনাদের উপরও নেমে আসে তখন আর কারো পরিত্রাণ লাভের উপায় থাকবে না। সুতরাং আবারও বলছি, ফিরে আসুন, সতর্ক হোন। সতর্ক হওয়ার এখনই সময়। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন। আমীন ।❐

(সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব ২১/০১/২০০০ইং)

ন্যায় বিচারের অনুপম দৃষ্টান্ত

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর শাসন কাল। মিশর বিজেতা হযরত আমর বিন আস (রা.) তখন মিশরের গভর্ণর। তাঁর শাসনে মিশরের সকল ধর্মের লোকেরাই পরম সুখে কালাতিপাত করছে। ঝগড়া-ফাসাদ দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই বললেই চলে। মুসলমানদের ভদ্রতা, উদারতা ও মার্জিত আচরণ ইতিমধ্যেই ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মন জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। সকলেই নির্বিঘ্নে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন খৃষ্টান সম্প্রদায় বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাদের সকলের মাঝেই একটি হৈচৈ ভাব পরিলক্ষিত হল। অশান্তি ও অস্থিরতার দাবানল মুহূর্তের মধ্যেই পুরো মিশরে ছড়িয়ে পড়লো।

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে মিশর রোমের অধিনস্থ একটি প্রদেশ ছিল। তৎকালীন রোমের সম্রাট হেরাক্লিয়াস প্রচুর অর্থ খরচ করে শহরের প্রধান রাস্তার মোড়ে যীশু খৃষ্টের একটি বিশাল মূর্তি স্থাপন করেছিল। গত রাতে কে বা কারা এ মূর্তির নাক ভেঙ্গে দিয়েছে। খৃষ্টানদের উত্তেজিত হওয়ার এই ছিল মূল কারণ।

যীশু খৃষ্টের নাক ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে এ তো সাধারণ কোন বিষয় নয়! সুতরাং সুযোগ পেয়ে নেতা গোছের পাদ্রীরা অনলবর্ষী বক্তব্য দিয়ে খৃষ্টানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললো। তারা বলল, এ জঘন্য কাজ মুসলমান ছাড়া আর কেউ করেনি। সুতরাং আমরা এর দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই।

এ খবর অল্পক্ষণের মধ্যেই মিশরের গর্ভণর হযরত আমর ইবনে আস (রা.) এর নিকট পৌঁছলে তিনি এর যথাযথ বিচার হবে বলে আশ্বাস দিয়ে দোষী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে কড়া নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, অন্য ধর্মের অনুসারীদের ধর্ম পালনে বাধার সৃষ্টি করা এবং তাদের ধর্মীয় নিদর্শনসমূহের ধ্বংস কিংবা ক্ষতি সাধন করা ইসলামী আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী।

গভর্ণরের নির্দেশ পেয়ে সমগ্র মিশরে ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু হলো। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালালো। কিন্তু কিছুতেই তারা সফল হলো না। এমনকি দোষী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার কোন সূত্রও খুঁজে পেলো না। স্বেচ্ছায় এসেও কেউ স্বীকার করলো না যে, আমিই এ কাজ করেছি।

এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর খৃষ্টানদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তারা গভর্ণরের দরবারে হাযির হয়ে বলল, যে কোন মূল্যে আমরা এ অপরাধের উপযুক্ত বিচার চাই। আমাদের মহান উপাস্য যীশুখৃষ্টের সাথে এ ধরণের মারাত্মক ধৃষ্টতার যথাযথ প্রতিশোধ নিতে চাই।

তাদের কথাবার্তা শুনে হযরত আমর ইবনে আস (রা.) অত্যন্ত নরম কণ্ঠে বললেন, দেখুন! দোষী ব্যক্তির যথাযথ বিচার হওয়ার দরকার- এব্যাপারে আমিও আপনাদের সাথে একমত। কিন্তু আমি

এখন কি করব বলুন। ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েও যে আমি অপরাধী সনাক্ত করতে পারিনি। আপনারাও তো কারও নাম বলতে পারছেন না। এখন আমি কাকে শাস্তি দেবো। আর কার কাছ থেকেই আপনারা এর প্রতিশোধ নিবেন?

আমর ইবনে আস (রা.) এর এ যুক্তিসংগত কথায়খৃষ্টানদের উত্তেজনা মোটেও কমলো না। বরং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এক পর্যায়ে তারা এ কথাও বলে বসলো যে, যদি বিষয়টির প্রতিকার আপনার দ্বারা সম্ভব না হয় এবং আমরা এর সুবিচার না পাই তাহলে আমরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করবো।

খৃষ্টান পাদ্রীরা হযরত আমর বিন আস (রা.) এর নম্রতা-ভদ্রতা ও সরলতাকে দূর্বলতা মনে করলো। এজন্যেই তারা হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এর ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর, ইতিহাসের কিংবদন্তী, নির্ভীক সিপাহসালার ও বর্তমান মিশরের গভর্ণরকে বিদ্রোহের হুমকী দিতে পারলো।

বিদ্রোহের কথা শুনে হযরত আমর ইবনে আস (রা.) এর চেহারায় এক টুকরো মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যেই মুচকী হাসির একটি স্বর্গীয় আভা তার ওষ্ঠ প্রান্তে বিলীন হলো। তিনি বললেন, অপরাধী ধরতে না পারলে আমি কাকে শাস্তি দিব বলুন। তবে এর একটি প্রতিকারের উত্তম পথ আছে। তা হলো, আপনারা একজন সুদক্ষ কারিগর দ্বারা একটি নাক তৈরী করে নিন। এতে যত টাকা ব্যয় হোক, তা আমি সরকারী কোষাগার থেকে দিয়ে দেব।

পাদ্রী এবার রাগতস্বরে উত্তেজিত হয়ে বললো, না আমরা তা মেনে নিতে পারি না। নতুন আর পুরাতন কোন দিনই এক হয় না। নতুন কি আর পুরাতনের মত হয়?

পাহাড়সম বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মিশর বিজেতা হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) পাদ্রীর কথায় উত্তেজিত না হয়ে আবারও শান্ত কণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে আপনারা পুরো মূর্তিটাই নতুনভাবে তৈরী করে নিন। আমি সম্পূর্ণ খরচ বাইতুল মাল থেকে বহন করবো।

নেতৃস্থানীয় পাদ্রীরা গভর্ণরের এই যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবটিও মানতে রাযী

হলো না। তাদের হৃদয়ে তখন নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক প্রতিশোধের অনল দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তাই পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক গভর্ণরের নতুন প্রস্তাবের জবাবে বললো, না তাও আমরা মেনে নেব না। নতুন মূর্তি কি মহামান্য হিরাক্লিয়াসের স্মৃতি বিজড়িত পুরাতন মূর্তি হবে? কখনোই নয়। তবে আপনারা আমাদের যীশু খৃষ্টের নাক ভেঙ্গে যে অপরাধ করেছেন, একটি পদ্ধতিতেই কেবল এর প্রতিকার হতে পারে। আর তা হচ্ছে আমাদের সামনে আপনাদের নবীর মূর্তি বানিয়ে দিন, আমরা তার নাক ভেঙ্গে দিব।

এতক্ষণ মিশর বিজয়ী কালজয়ী ব্যক্তিত্ব হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) অত্যন্ত শান্ত মেজাজেই কথাবার্তা বলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এবার পাদ্রীর এ উদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে তার সমস্ত দেহ শিহরিয়ে উঠলো। রাগে গোস্বায় অস্থির হয়ে উম্মুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে পায়চারী করতে করতে তিনি বললেন, ওহে মূর্খ পাদ্রী! তোমার ধৃষ্টতা আজ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমার উদারতা ও সহিষ্ণুতার সুযোগে তুমি যে নাপাক কথা মুখে উচ্চারণ করেছো, খবরদার আর কোনদিন দ্বিতীয়বার এরূপ কথা আর মুখে আনবে না। তোমাকে আমি সতর্ক করে দিয়ে বলছি, তোমার এ কথা যেন বাইরের কেউ জানতে না পারে। কেননা এতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে যে আগুন প্রজ্বলিত হবে সে আগুনে তুমিও তোমার দলবলসহ জ্বলে যেতে পার। তখন হয়তো আমাদেরও করার কিছু থাকবে না।

একশ্বাসে কথাগুলো বলে অনুপম চরিত্রের অধিকারী হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) স্বীয় গোস্বাকে সংবরণ করে বললেন, তোমাদের কথাবার্তায় আমি এতটুকু আঁচ করতে পেরেছি যে, তোমরা তোমাদের যীষুর মূর্তির নাকের পরিবর্তে একটি নাক চাও। খুন দেখতেই যখন তোমাদের এত আগ্রহ, খুনই যখন তোমাদের নিকট এত পছন্দের সুতরাং এর প্রতিকার হিসেবে আমি নিজের নাক কেটে দিতে প্রস্তুত আছি। তবুও আমাদের হৃদয় রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট দোজাহানের বাদশাহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কোনরূপ বেয়াদবীমূলক কথা উচ্চারণ করবে না।

এখনকার প্রস্তাবটি পাদ্রীর খুবই মনপুত হলো। সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সাথে সাথে বলে উঠলো, বেশ তাই হবে। আগামীকাল সকালে হাজার লোকের সামনে আমি আপনার নাক কেটে দিব।

কে বা কারা মূর্তির নাক ভেঙ্গেছে তা জানা নেই। অথচ এই অপরাধে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ মিশরের গভর্ণর হযরত আমর ইবনে আস (রা.) এর নাক কাটা হবে এর চেয়ে আশ্চর্যজনক সংবাদ আর কি হতে পারে? সুতরাং মুহূর্তের মধ্যে পুরো মিশরে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো।

এ বিস্ময়কর সংবাদ শ্রবণে একদিকে খৃষ্টানদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে চললো। হাসি তামাশা আর অনিয়ন্ত্রিত উল্লাসে তাদের ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। আর অপরদিকে মুসলমানদের হৃদয়গুলো ক্ষোভে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। বেদনার অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এলো তাদের নয়নগুলো।

পরদিন সকাল। চারিদিকে মৃদু মন্দ হিমেল সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে। এক বিশাল ময়দানে হাজার হাজার লোক সমবেত। সকলেই এসেছে মুসলিম সেনাপতি হযরত আমর বিন আস (রা.) এর নাক কাটার অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করতে।

নির্দিষ্ট সময়ে হযরত আমর বিন আস (রা.) যথাস্থানে উপস্থিত হলেন। এমন সময় হাজারো লোকের মাঝ থেকে ক্ষীপ্র গতিতে বের হয়ে এলো এক পাদ্রী। তার হাতে ধারালো একখানা নতুন ছুড়ি। চেহারায় দুষ্টের মিষ্টি হাসি। সকালের সোনালী রৌদ্র ধারালো ছুড়ির উপর পড়ে চকচক করছে। দুষ্ট পাদ্রী যেনো রক্ত পিপাসায় অস্থির।

একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভর্ণরের নাক কাটা যাবে মুসলমানগণ এহেন অপমান কিছুতেই বরদাশত করতে পারছিলেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের করারও কিছু ছিল না। কেননা নাক কাটার প্রস্তাব তো গভর্ণর নিজেই দিয়েছেন।

চতুর্দিকে নীরব নিস্তব্ধ। কোথাও পিনপতনের শব্দও নেই। সকলেই যেন পাথর হয়ে গেছে। মুসলমানগণ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় উদ্‌গত অশ্রু ঠেকাবার চেষ্টা করছেন। সেনাপতি আমর (রা.) মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। পাদ্রী তার তীক্ষ্ণ ছুড়ি উপরে তুলে ধরছে। এখনই সে

মুসলিম সেনাপতির নাক কেটে তার জঘন্য হিংসাকে চরিতার্থ করবে। সকলের দৃষ্টিই তখন পাদ্রীর হস্তে ধারণ করা চকচকে ধারাল ছুড়ির দিকে।

এরই মধ্যে জনতার ভীড়ের মাঝ থেকে একজন মুসলমান চিৎকার করে বলে উঠলেন, থামুন। চিৎকার শুনে পাদ্রী থেমে গেল। সে তার তীক্ষ্ণ ছুড়িটি সেনাপতি আমরের নাকে বসাতে গিয়েও বসাতে পারলো না। এতক্ষণে চিৎকার দেয়া লোকটি জনতার ভীড় ঠেলে পাদ্রীর সামনে এসে দাঁড়ালেন, অতঃপর বললেন-

পাদ্রী সাহেব! আপনাদের মূর্তির নাক ভাঙ্গার ব্যাপারে আমিই প্রকৃত অপরাধী। এজন্য যা শাস্তি হবে তা আমারই প্রাপ্য। বিশ্বাস না হয়, এই নিন আপনার ভাঙ্গা নাক। একথা বলে লোকটি জামার গোপন পকেট থেকে মূর্তির ভাঙ্গা নাকটি নিয়ে পাদ্রীর হাতে তুলে দিলেন।

যিনি মূর্তির নাক ভাঙ্গার অপরাধ স্বীকার করলেন তিনি ছিলেন একজন নবীন সৈনিক। বয়সে তরুণ। পাদ্রীর হাতে ভাঙ্গা নাকটি তুলে দেওয়ার পর সেনাপতি আমর নবীন সৈনিকটিকে লক্ষ্য করে ধমকের স্বরে বললেন, বোকা কোথাকার! তুমি এ কাজ কেন করলে? তুমি কি জান না যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় নিদর্শন সমূহের ক্ষতি সাধন করা ইসলামী আইনের পরিপন্থী?

তরুণ সৈনিকটি জবাবে বললেন, মহামান্য সেনাপতি! আমি ইচ্ছা করে এমনটি করিনি। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়ই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। আশা করি আমার কথাগুলো মনযোগ সহকারে শুনলেই আপনি তা সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

ব্যাপার হলো, আগের দিন আমি পাখি শিকারের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হই। রাস্তায় তখন কোন লোকজন ছিল না। আমি শিকারের খুঁজে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি পাখি আমার দৃষ্টিগোচর হলো। পাখিটি তখন যীশু খৃষ্টের মূর্তির নাকের ডগায় বসা ছিল। আমি ঐ পাখিটি শিকার করার জন্য তীর চালিয়ে দিলাম। কিন্তু সাথে সাথে পাখিটি উড়ে যাওয়ায় আমার তীরটি পাখির গায়ে না লেগে মূর্তির নাকে লেগে যায় এবং তাতে নাকটি ভেঙ্গে নীচে পড়ে যায়। আমি

ভেবেছিলাম, এ তুচ্ছ বিষয়টি নিয়ে তেমন কিছুই হবে না। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটতে যাচ্ছে, তা ছিল আমার কল্পনারও বাইরে। ঘটনাটি যদিও আমার অনিচ্ছায় হয়েছে; তারপরেও এজন্য কেবল আমিই দায়ী। আমিই অপরাধী। আর আমার অপরাধের জন্য আরেকজন শাস্তি ভোগ করবে তা কিছুতেই হতে পারে না। উপরন্ত তিনি আমাদের মহামান্য সেনাপতি ও এ শহরের গভর্ণরও বটে। তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখে আমি নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিলাম।

তরুণ সৈনিকটির কথা শুনে পাদ্রী তার হাতের ছুড়িটি দূরে ছুঁড়ে মারল। অতপর সে বললো, আমাদের প্রতিশোধ নিতে হবে না। আমরা উপযুক্ত বিচার পেয়েছি। আমাদের বুঝতে বাকী নেই যে, কোন্ গুণের কারণে মুসলমানগণ দিন দিন বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। কোন্ গুণের কারণে সারা বিশ্ব জুড়ে তাদের হেলালী নিশান পতপত করে উড়ছে। যাদের মহান সেনাপতি প্রদেশের গভর্ণর একটি পাথরের নাকের পরিবর্তে নিজের নাক কেটে দিতে প্রস্তুত; যাদের উঠতি বয়সের তরুণরা নির্দোষ ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য স্বেচ্ছায় আপন অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে চরম বিপদের সম্মুখীন করতে পারেন, তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষন করা নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ারই নামান্তর। আমাদের ভুল ভেঙ্গেছে। সুতরাং আমরা আর এর বিচার চাই না। এ বলে সে সকলের সাথে আলিংগন করল।

বাড়ীতে ফেরার পথে খৃষ্টান-কাফেররা মনে মনে একথা চিন্তা করে আশ্চর্য হলো- যে কানন কুঞ্জের মালি এতটা উদার সর্বস্ব, না জানি তার পুষ্প কলি কতটা সুবাসিত। না জানি, সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত তাদের নবী আরও কত বেশী দয়াবান ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হযরত সাহাবায়ে কেরামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের পদাংক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ❐

মহীয়সী মা

আব্দুর রহমান নামের এক বীর মুজাহিদ। খোদার এক অকুতোভয় সৈনিক তিনি। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যেন তার সখে পরিণত হয়েছে। খোদার জমীনে খোদার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াঁনোকেই তিনি জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

একদা এই মহান সৈনিক স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জিহাদে চলে গেলেন। তখন তার স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্তা। যাবার সময় তিনি স্ত্রীর কাছে ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা রেখে গেলেন। এরপর এক দুই করে অনেক বছর কেটে গেল। কিন্তু তার বাড়ীতে ফেরার নাম গন্ধ নেই। অবশেষে দীর্ঘ উনত্রিশ বছর পর তিনি বাড়ী ফিরেন।

ঘোড়া থেকে নেমে সৈনিক বর্শা দিয়ে দরজায় আঘাত করলে এক টগবগে যুবক ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। যুবক আগন্তুকের হাতে বর্শা দেখে বলে, হে আল্লাহর দুশমন! তুমি কি আমার বাড়ী হামলা করতে এসেছ?

যুবকের কথা শুনে লোকটি তাজ্জব হয়ে গেলেন। মনে মনে বললেন, বলে কি এই যুবক! এটা আমার বাড়ী আর সে কিনা আমাকেই ডাকাত বলে ঠাওরাচ্ছে? সৈনিক গর্জে উঠলেন। বললেন, কে তুমি? সাহস তো তোমার কম নয়। কত বড় স্পর্ধা তোমার! আমার বাড়ীর অন্দরে ঢুকে আমাকেই ডাকাত বলে সম্বোধন করছ?

এবার যুবকের আশ্চর্য হওয়ার পালা। কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গিমা দেখে সে অনেকটা আনমনেই বলে ফেললো, এই অজানা অচেনা বুড়ো দেখি উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো কথা বলছে। তার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে আমি দিবাস্বপ্ন দেখছি।

এরপর উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি হয়। এবং এক পর্যায়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শুরু হল তুমুল লড়াই। কেউ কাউকে ছাড়বার পাত্র নয়। দিন দুপুরে এমন লড়াই ও হুংকারে পাড়ার সব লোক এসে জড়ো হলো এবং কোন মতে তাদের থামাল। এবার সবাই যুবকের পক্ষ নিল। যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে বললো, একে কাজীর দরবারে সোপর্দ না করে ছাড়ছি না।

মুজাহিদ লোকটিও হুংকার ছেড়ে বললেন, তোমাকেও আমি বিচারালয়ে নিয়ে যাব। সেখানেই তোমার ফায়সালা হবে। প্রতিবেশীরা লোকটির দৃঢ়তা দেখে দ্বিধা দ্বন্ধে পড়ে গেল। তারা বললো, আপনি বোধ হয় বাড়ী চিনতে ভুল করেছেন। এই বাড়ী ওদেরই। ওরা বহু দিন ধরে এখানে থাকছে।

মুজাহিদ লোকটি বললেন, না, তা হতেই পারে না। আমি ঠিকই চিনেছি। যে বাড়ীর প্রতিটি ধুলিকনার সাথে আমার হৃদয়ের সম্পর্ক সেখানে ভুল হওয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। এ বাড়ী আমার। আমি তো অমুক গোত্রের সর্দার।

যুবকের মা কোন এক জরুরী কাজে অন্য এক বাড়ীতে চলে যাওয়ায় এসব ঘটনার কিছুই তিনি জানতে পারেননি। কাজ সেরে এই মাত্র তিনি বাড়ী ফিরেছেন। বাড়ীর আঙ্গিনায় অনেক লোকের জটলা দেখে তিনি ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন, কি হয়েছে বাবা! বাহিরে এত লোকজন কেন? কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? ছেলে বললেন, মা কোথাকার এক লোক এ বাড়ীতে ঢুকে বাড়ীর মালিকানা দাবী করছেন। তিনি বলছেন যে, এ বাড়ীর প্রতিটি ধুলিকণার সাথে তার নাকি আত্মার সম্পর্ক রয়েছে।

ছেলেটি এতটুকু বলতেই মা জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালেন। দেখলেন, তারই প্রাণপ্রিয় স্বামী মুজাহিদ বেশে লোকদের সাথে কথা বলছেন। এতদিন পর স্বামীর চেহারা দেখতে পেয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে চোখের কিনারায় উছলে উঠা দু'ফোটা অশ্রু আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, বাবা! এ তোমার জন্মদাতা পিতা। আজ থেকে উনত্রিশ বছর পূর্বে জিহাদে চলে গিয়েছিলেন তিনি। এজন্য আমিই তাকে উৎসাহ যুগিয়েছিলাম। তখন তুমি আমার গর্ভে ছিলে।

আজ দীর্ঘদিন যাবত তাঁর খোঁজ খবর না পেয়ে ভেবেছিলাম তিনি খোদার রাহে শহীদ হয়েছেন। যাও বাবা, আগে তাকে সসম্মানে ঘরে নিয়ে এসো। তারপর বাকী কথা হবে।

যুবকটির নাম ছিল রাবী। মায়ের কথা শুনে তিনি ভীষণ লজ্জিত হলেন। ভাবলেন, এতক্ষণ কি তাহলে জন্মদাতা পিতার সঙ্গেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। হায় আফসোস! কেন আমি আগে তার পূর্ণ পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম না। তাহলে তো এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না।

যা হোক, যুবক তার ভুল বুঝতে পেরে দৌড়ে গিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আব্বা। আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। লোকটিও ছেলেটিকে না চিনে নানা কথা বলায় দরুন লজ্জা পেলেন। বললেন, ঘরে চল বাবা, আমি কিছু মনে করিনি। আমিও তোমাকে অনেক কথা বলে ফেলেছি।

ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে বললেন, আমার ছেলে এত বড় হয়ে গেছে!

স্ত্রী বললেন, হবে না, সেই কবে আপনি যুদ্ধে বেরিয়েছেন। ফিরলেন এত দিন পরে।

ঃ আমার রেখে যাওয়া ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা হেফাযত করে রেখেছো তো। এই নাও। এই থলের মধ্যে চল্লিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আছে। এগুলো একসাথে মিলিয়ে রাখো।

ঃ স্ত্রী নতুন থলেটি হাতে নিতে নিতে বললেন, হ্যাঁ আপনার রেখে যাওয়া স্বর্ণ মুদ্রাগুলো জায়গা মতোই হেফাযত করে রেখেছি।

ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে।

কিছুক্ষণ পর মসজিদের সুউচ্চ মিনারা থেকে আজানের স্বর্গীয় সুর লহরী ভেসে এলে যুবক নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে চলে গেলেন। খানিক পর মুজাহিদ আবদুর রহমানও মসজিদ পানে অগ্রসর হলেন। স্ত্রী স্বামীর গমন পথের দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়ে রইলেন।

নামায শেষে মুজাহিদ লোকটি দেখলেন মসজিদ চত্বরে বহু লোকের সমাগম। হঠাৎ এত লোকের আনাগোনা দেখে তিনি বিস্মিত

হলেন। কারণ জানার জন্য কাছে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, এক অল্প বয়সী যুবক জড় সড়ো হয়ে নতমুখে হাদীসের দরস দিচ্ছেন। আর তার দরস শোনার জন্য তৎকালীন যুগের বড় বড় ফকীহ ও ইমামগণ নিবিষ্টচিত্তে মৌমাছির ন্যায় ঝাঁক বেঁধে আদবের সাথে বসে রয়েছেন। যুবক অনর্গল হাদীস বলে যাচ্ছেন। আর সামনে উপবিষ্ট ছাত্ররা মনযোগ সহকারে তা শুনছেন এবং নিজ নিজ খাতায় লিখে নিচ্ছেন। দূর থেকে দরস দানকারীর চেহারা ভাল করে চিনা যাচ্ছিল না বিধায় তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! কে এই সৌভাগ্যবান ছেলে?

জবাবে লোকটি বলল, ইনি হলেন মদীনার সবচেয়ে বড় ফকীহ ইমাম রাবী বিন আব্দুর রহমান। ছেলের পরিচয় পেয়ে পিতা যার পর নাই খুশী হলেন। আনন্দের অশ্রুতে তার দুচোখ ভরে গেল। তিনি ছেলের জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করলেন এবং আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বললেন, আমি আজ তোমার ছেলেকে এমন অবস্থায় দেখেছি, যে অবস্থায় খুব কম পিতাই তার ছেলেকে দেখতে পায়। সত্যিই আমি একজন সৌভাগ্যবান পিতা। এই সোনার ছেলের পিতা হতে পেরে সত্যিই আমি গর্বিত।

স্ত্রী সুযোগ পেয়ে একটি সুন্দর মিষ্টি হাসি স্বামীকে উপহার দিয়ে বললেন, আপনি কি এই ছেলে চান, না ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা চান? প্রতি উত্তরে স্বামীও একটি মুচকি হাসির রেখা ওষ্ঠ প্রান্তে বিলীন করে বললেন-

ঃ বল কি তুমি! এমন ধন্য ছেলের চেয়ে প্রিয় জিনিস পৃথিবীতে আর কি হতে পারে? স্বর্ণমুদ্রা তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আজ আছে কাল নেই। উপরন্ত এগুলো তো আমার সাথেও যাবে না।

ঃ আপনার রেখে যাওয়া স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমি এই সোনার ছেলে গড়েছি। আপনি কি এতে খুশি?

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আমি খুশি। আজ আমার খুশির সীমা নেই। তোমার মতো মহীয়সী মা যার আছে, সে তো এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। আমার কষ্টার্জিত সম্পদ তুমি সঠিক পথেই ব্যয় করেছ। আল্লাহ তোমাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আমরাও কি পারি না এমন সৌভাগ্যবান সোনার ছেলের পিতা মাতা হতে? হ্যাঁ পারি। এজন্য শুধু খালেছ নিয়ত, আন্তরিক দোয়া ও হিম্মতের প্রয়োজন। মনে রাখবেন, একজন হক্কানী আলেমের পিতা-মাতা হতে পারা জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হাতে পাওয়ার চেয়েও অধিকতর শ্রেয়। এ চিরন্তন সত্য কথাটি আজ বুঝে না আসলেও সেদিন খুব ভাল করেই বুঝে আসবে যেদিন আপনি এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন এবং আল্লাহপাক কুরআন তিলাওয়াত কারীর মাতা পিতাকে এমন একটি নূরের তাজ পড়িয়ে দিবেন যার জ্যোতি সূর্যের জ্যোতি হতেও অধিকতর উজ্জ্বল হবে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে এ সত্য-সুন্দর কথাটি বুঝে নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে আলেম, হাফেজ, মুফতি, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির বানানোর তাওফীক নসীব করুন। আমীন। ❐

যেমন বৃক্ষ তেমন ফল

জনৈক মুসাফির। দীর্ঘ পথ চলতে চলতে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এক দিকে পথ চলার কষ্ট অন্যদিকে ক্ষুধার যন্ত্রনায় সীমাহীন কাতর হয়ে পড়েছেন তিনি। কিন্তু কি আর করা, তাকে যে আরো বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। কষ্ট যতই হউক না কেন, আপন গন্তব্যে তাকে পৌছতেই হবে।

নদীর কোল ঘেষে বয়ে যাওয়া পথ ধরেই ধীরে ধীরে হেটে চলছেন তিনি। স্রোতের অবিরাম কলকল ধ্বনি তার কানে ভেসে আসছে। ক্ষুধার কারণে দুর্বলতা হেতু তার পথ চলা বারবার বাধাগ্রস্থ হলেও আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি এক পা দু পা করে সামনে এগিয়ে চলছেন।

মুসাফির লোকটি বয়সে তরুণ। সবেমাত্র কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পন করেছেন। দীর্ঘ সফর ও প্রচন্ড ক্ষুধার কারণে তার চাঁদের মত সুন্দর মুখটি অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। তার নিকট মুখে

দেওয়ার মত কোন খাবার ছিল না। নিকটে কোন লোকালয় না থাকায় কোন কিছু কিনে খাওয়াও সম্ভব হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় প্রচন্ড ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে বার বার তার হৃদয়ের মনিকোটায় একথা জাগ্রত হচ্ছিল যে, আহা! এখন যদি কুদরতী ভাবে আমার জন্য সামান্য খাবারের ব্যবস্থা হত তাহলে কতই না ভাল হত।

একথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তার দৃষ্টি স্রোতের পানিতে আটকে গেল। তিনি সীমাহীন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, একটি তরতাজা সুন্দর ছেবফল স্রোতের পানির সাথে তারই দিকে ভেসে আসছে। এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, এটা আমার জন্য খোদার পক্ষ থেকে এক অপূর্ব নেয়ামত। তাই ফলটি কাছে ভিড়তেই তা উঠিয়ে খেয়ে নিয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণা প্রশমিত করলেন।

ফল খেয়ে শেষ করার পর তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, হায়, আমি একি করলাম! এ ফলটির তো নিশ্চয়ই কোন মালিক আছে। আমি তো মালিকের অনুমতি ছাড়াই উহা খেয়ে ফেলেছি। হায়, আমার কি অবস্থা হবে! আমি খোদার দরবারে এর কি জবাব দিব।

যুবক মুসাফির বিনা অনুমতিতে অপরের ফল খাওয়ার জন্য খুবই অনুতপ্ত ও দুঃখিত হলেন। তিনি এর পরিণাম চিন্তা করে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তা ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হলেন যে, যেভাবেই হোক ফলের মালিক খুঁজে বের করে তার নিকট অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে। যদি তিনি মেহেরবাণী করে আমাকে ক্ষমা করে দেন তাহলেই কেবল আমি মুক্তি লাভ করতে পারি। অন্য কোন উপায়ে আমার মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তিনি কালবিলম্ব না করে প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করার জন্য যেদিক থেকে ফলটি ভেসে এসেছিল সেদিকে হাটতে শুরু করলেন। দীর্ঘ পথ চলার পর নদীর তীরে তিনি একটি ফলের বাগান দেখতে পেয়ে বড়ই খুশি হলেন। ভাবলেন, আমি যে ফল খেয়েছি তা হয়তো এ বাগানেরই হবে। সুতরাং এখন বাগানের মালিককে খুঁজে পেলেই আমার কৃত অন্যায়ের প্রতিকার করার পথ সুগম হবে।

বেশ কিছুক্ষণ খুঁজাখুঁজির পর তিনি মালিকের সাক্ষাত পেয়ে প্রথমেই আলহামদুলিল্লাহ বলে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন অতঃপর সালাম মোসাফাহা ও কুশল বিনিময়ের পর বিনাঅনুমতিতে ফল খাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, আমি ক্ষুধার যন্ত্রনায় অতিষ্ট হয়ে নদীর কিনারে হাটতে ছিলাম। হঠাৎ স্রোতের পানিতে ভেসে আসা একটি ছেবফল দেখতে পেয়ে কোন কিছু চিন্তা না করেই তা উঠিয়ে খেয়ে ফেলি। কিন্তু পরক্ষণেই আমার চিন্তা হল, এ ফলের তো নিশ্চয়ই কোন মালিক আছে। আমি তো তার অনুমতি ছাড়াই তা খেয়ে ফেললাম। আর অন্যের মাল অনুমতি ছাড়া খাওয়া বৈধ নয়।

কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির মাল তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে গ্রহণ করা বৈধ নয়। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, যদি আমি ফলের মালিককে খুঁজে বের করতে পারি এবং তার নিকট ক্ষমা চাইতে পারি তাহলেই আমার এ কৃত অপরাধ মাফ হতে পারে। তাই আমি মালিকের খুঁজ করতে করতে আপনার নিকট এসে পৌঁছলাম। যেহেতু নদীর কিনারে আপনার বাগান ছাড়া অন্য কোন বাগান নেই সেহেতু আমার প্রবল ধারণা হল, আপনিই হবেন সেই ফলের মালিক। আমার সৌভাগ্য যে, কয়েক মাইল পথ পাড়ি দিয়ে অনেক কষ্ট করে হলেও আমি আপনার সাক্ষাত পেয়েছি। সুতরাং আপনি যদি আমাকে মেহেরবাণী করে ক্ষমা করে দেন তাহলেই আমি এর শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পেতে পারি। অন্যথায় আমার ধ্বংস অনিবার্য।

যুবকের কথা শুনে মালিক বিস্ময়ে হা করে রইলেন। কিছুক্ষণ তার মুখ থেকে কোন কথা বের হলো না। ভাবলেন, এ যুবকতো সাধারণ কোন যুবক হতে পারে না। আমার বাগান থেকে নদীতে পড়ে যাওয়া কত হাজারো ফল কত মানুষ খেয়ে নিল কিন্তু কেউ তো আজ পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে এলো না। কেউ কখনো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনও বোধ করেনি। যে ছেলে ক্ষুধার যাতনায় পিষ্ট হয়ে কুড়িয়ে পাওয়া একটি ফল অনুমতি ব্যতিত খেয়ে ফেলার কারণে এতটা বিচলিত হয়ে পড়তে পারে এবং এর ক্ষমা পাওয়ার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করতে পারে সে নিশ্চয়ই কোন আল্লাহ ওয়ালা ছেলে না হয়ে পারে না। তার অন্তরে খোদার ভয় পূর্ণ মাত্রায় আছে বলেই সে এমনটি করতে পেরেছে।

আমারও সৌভাগ্য যে, আমি বহুদিন পর একটি উপযুক্ত ছেলে পেয়েছি।

বাগানের মালিকের ছিল এক সুন্দরী কন্যা। কুদরত যেন নিজ হাতে তাকে তৈরী করেছেন। শুধু রূপই নয়, একটি আদর্শ মেয়ের মধ্যে যতগুলো গুণ থাকা দরকার তার সবই মেয়েটির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। উক্ত মেয়ের জন্য বাগানের মালিক আজ বেশ কয়েক মাস যাবত একটি দীনদার পরহেজগার ও আল্লাহওয়ালা পাত্র খুঁজছিলেন। সুতরাং উক্ত যুবককে পেয়ে তিনি মনে মনে খুব খুশি হলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই যুবকের হাতেই আমার নিজ হাতে গড়া কলিজার টুকরা মেয়েকে উঠিয়ে দেব।

যুবকের ক্ষমা চাওয়ার পর বাগানের মালিক কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। অতঃপর বললেন, বাবা আমি তোমাকে কেবল একটি শর্তেই ক্ষমা করতে পারি। যদি তুমি এ শর্ত পালন কর তাহলেই কেবল তুমি মুক্তির আশা করতে পার। অন্যথায় নয়।

যুবক বলল, আমি অপরাধী। সুতরাং একটি কেন, যত শর্তই আপনি দেন, তা মানার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। যে কোন মূল্যে আমাকে ক্ষমা পেতেই হবে। শর্ত যত কঠিনই হউক না কেন তা আমাকে পালন করতেই হবে। জনাব! দেরী না করে অনুগ্রহ পূর্বক আপনার শর্তটি কি তা বলার জন্য অনুরোধ করছি।

মালিক বললেন, আমার একটি অন্ধ, খোঁড়া, বোবা ও বধির মেয়ে আছে। ক্ষমা পেতে চাইলে এই মেয়েটিকেই তোমার বিয়ে করতে হবে। যুবক ক্ষমার আশায় এই কঠিন শর্তটি মেনে নিতে সম্মত হল। বলল, আপনার এইরূপ মেয়েকে বিবাহ করার বদলেও যদি আমি ক্ষমা পেয়ে যাই তাহলে একে আমার জন্য পরম সৌভাগ্যই মনে করব।

যাহোক, এই অসম বিয়েতে যুবক রাজী হওয়ার পর নিয়ম মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে বিয়ে হয়ে গেল।

এবার অন্ধ, বোবা, বধির ও খোঁড়া নববধুর সাথে সাক্ষাতের পালা। রাত যখন কিছুটা গভীর হল তখন বাগানের মালিক নতুন জামাতাকে একটি কামরা দেখিয়ে বললেন, এতে প্রবেশ কর। এখানে

যে মেয়েটি আছে সেই তোমার জীবন সঙ্গীনী। সুখ দুঃখের সাথী।

শ্বশুরের নির্দেশে যুবক ধীরে ধীরে কামরায় প্রবেশ করলেন। দেখলেন, এক অনিন্দ সুন্দরী রূপসী মেয়ে খাটের উপর উপবিষ্ট আছে। প্রিয়তম স্বামীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই মেয়েটি বলে উঠল, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

যুবকটি এরূপ একটি পরিস্থিতির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তার শ্বশুর আপন মেয়ের যেসব গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছিলেন তার একটিও মেয়ের মধ্যে নেই। তাই তিনি ভীত বিহবল হয়ে মনে মনে বললেন, এই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি কে? আমার স্ত্রী তো এমন হওয়ার কথা নয়। আমাকে কোন ঈমানী পরীক্ষায় ফেলা হয়নি তো? এই নির্জন নীরব কুটিরে এক সুন্দরী ষোড়শীর নিকট আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হল। আমাকে ঈমান হারা করা হবে না তো?

এসব কথা চিন্তা করতে করতে যুবক মানসিক অস্থিরতায় ভয়ে কাঁপতে শুরু করলেন। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর তার মধ্যে ভাবোদয় হয় যে, মালিক আমার শ্বশুর। খাটে উপবিষ্ট মেয়েটিকে তিনিই আমার স্ত্রী বলেছেন। সুতরাং আমার ভয়টা কিসের? এ জাতীয় আরো কিছু কথা চিন্তা করার পর তার মনের ভিতর সাহস সঞ্চয় হল। তিনি মেয়েটির কাছে গেলেন এবং তার সাথে আমোদ-ফুর্তি করতে করতে রাতের দুই তৃতীয়াংশ কাটিয়ে দিলেন।

অতঃপর শেষ রাতে উভয়ই পবিত্রতা অর্জন করে তাহাজ্জুদ আদায় করলেন এবং তাদের জীবন সুখময় হওয়ার জন্য খোদার দরবারে কায়মনোবাক্যে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা জানালেন।

এভাবে বাকী রাত অতিবাহিত করার পর ফজরের নামায আদায় করে সকাল বেলায় যুবক যখন শ্বশুরের নিকট সাক্ষাত করে বলল যে, আপনি তো বলেছিলেন আপনার মেয়ে চোখে দেখে না, কানে শুনে না, কথা বলতে পারে না, এমনকি হাঁটা চলারও ক্ষমতা নেই অথচ বাস্তবে তো তার একটিও খুঁজে পেলাম না।

একথা শুনে মেয়ের পিতা কসম খেয়ে বললেন, অবশ্যই আমার

মেয়ে অন্ধ, বোবা, বধির ও খোঁড়া। শ্বশুরের কথা শুনে জামাতার বুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপক্রম হল। মনে মনে ভাবলেন, তাহলে সারা রাত আমি কার সাথে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত ছিলাম? এক পাপের ক্ষমা নিতে এসে তো অন্য পাপে জড়িয়ে গেলাম। হায়, আমি একি করলাম!

জামাতার চেহারা পানে তাকিয়ে শ্বশুর সবই বুঝলেন। তাই তিনি জামাতার সংশয় সন্দেহ দূর করার জন্য বললেন, বাবা! বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথেই রাত্রি যাপন করেছেন? তবে আমি কেন তাকে অন্ধ, বোবা, বধির ও খোঁড়া বলেছি তা একটু শুনে নিন। এতটুকু বলে নয়ন যুগলে উছলে উঠা আনন্দাশ্রুকে ঠেকাবার চেষ্টা করলেন তিনি। তারপর আবেগাপ্লুত অথচ অতীব গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-

আমার মেয়ে যেদিন থেকে বালেগা হয়েছে এবং হালাল হারাম বুঝতে শিখেছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে কোন হারাম জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি। কোন বেগানা পুরুষের দিকে তাকায়নি। এ দৃষ্টিকোন থেকে আমি তাকে অন্ধ বলেছি। অনুরূপভাবে প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি সে কোন অন্যায় কথা মুখে উচ্চারণ করেনি। মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দা, চোগলখোরী, অশ্লীল ও অশালীন কথাবার্তা বলাও শুনা থেকে সর্বদাই সে দূরে থেকেছে। কোন পর পুরুষের সাথে কখনো সে কথা বলেনি। কোন পর পুরুষের কথা সে কখনো শুনেওনি। এ দৃষ্টিকোন থেকেই আমি তাকে বোবা ও বধির বলেছি। এমনিভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল যে রাস্তায় চলতে নিষেধ করেছেন, যে স্থানে পা ব্যবহার করতে বারণ করেছেন সে রাস্তায় আদৌ সে চলেনি। এ অর্থেই আমি তাকে খোঁড়া বা লেংড়া বলেছি।

প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করে দেখুন। বাগানের মালিক তার মেয়েকে কিভাবে বড় করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তার মেয়েকে বাড়ীতে রেখে পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা, তাকওয়া-পরহেজগারী, সবর-শোকর, তাওয়াক্কুল, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শরয়ী পর্দা এবং দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঠিক ব্যবহারও শিক্ষা দিয়েছেন। উপরন্ত বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাকে ১৮পারা কুরআনের হাফেজাও

বানিয়েছেন। মোট কথা, একটি আদর্শ নারীর মধ্যে যতগুলো মানবীয় গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তার সবই তিনি মেয়েকে শিক্ষা দিয়েছেন।

সম্মানিত পাঠক পাঠিকাগণ! এতক্ষণে হয়তো আপনাদের ভাল করেই বুঝে এসেছে যে, বাগানের মালিকের কন্যা ও তার জামাতা কোন পর্যায়ের দীনদার ছিলেন। সুতরাং এরূপ দম্পত্তির ঘরে কোন আল্লাহ ওয়ালা সন্তান জন্ম নিবে- এটাই তো স্বাভাবিক। আর বাস্তবেও হয়েছিল তাই। পরবর্তীতে ঐ মেয়ের গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলেন, জগত বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (র.) যিনি মায়ের পেট থেকে ১৮পারা কুরআনের হাফেজ হয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন।

আমার প্রাণের ভাইগণ! কথায় বলে, যেমন বৃক্ষ তেমন ফল । তেতুল গাছ লাগিয়ে যেমন আঙ্গুর ফলের আশা করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয় ঠিক অনুরূপভাবে একজন বেহায়া ও বদদীন নারীর গর্ভে সভ্য, সৎ ও খোদাভীরু সন্তানের আশা করাও দুরাশা বৈ কিছুই নয়। যে সব মেয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ফরয পর্দার বিধানকে পালন করে না, পেট, পিঠ ও দেহের লোভনীয় অঙ্গগুলো প্রদর্শন করে রাস্তায় চলা ফেরা করে, বিয়ের পূর্বেই বয়ফ্রেন্ডদের সাথে গাল-গল্প ও আড্ডায় মেতে উঠে, যারা দিনরাত টিভি- ভিসিআরে অশ্লীল ও কুরুচীপূর্ণ ছবি দর্শন করে, যারা নামায রোজা ও ইসলামের বিধি বিধান পালনের ধার ধারেও না তাদের গর্ভ থেকে কি করে নেককার, পরহেজগার ও আল্লাহওয়ালা সন্তান আশা করা যায়?

সম্মানিত পাঠক, আমার এ বইখানা যদিও গল্পের বই তথাপি এখানে প্রসঙ্গক্রমে পর্দা সম্পর্কে আর দু চারটি কথা না বললে আমার মনে হয় লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই আপনাদেরকে ধৈর্যসহকারে পর্দা প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, নারী দেহ অম্ল ও চুম্বকধর্মী এবং পুরুষের দেহ ক্ষার ও বিদ্যুতধর্মী। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী অম্লের প্রতি ক্ষারের আকর্ষণ তীব্র ও অনমনীয়। একইভাবে চুম্বকধর্মী পদার্থের প্রতি বিদ্যুতধর্মী পদার্থের আকর্ষনও প্রবল। কাজেই নারীদেহের কোন অংশ

খোলা থাকলে পুরুষ ঐ অংশর উপর প্রকৃতিগত কারণেই বারবার দৃষ্টি ফেলতে চায়। আর এমতাবস্থায় মানুষ একমাত্র খোদার ভয়েই এ পাপ থেকে বাঁচতে পারে। কিন্তু যাদের অন্তরে খোদার ভয় পূর্ণমাত্রায় বসেনি, যাদের হৃদয় বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের পক্ষে এ পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং দৃষ্টিকে সংযত রাখা কিছুতেই সম্ভব হবে না। এতে চুম্বকধর্মী দেহের (নারীর) উপর বিদ্যুতধর্মী দেহের (পুরুষের) প্রতিফলনের ফলে নারী দেহের কোমলতা ও লাবন্যতা হারিয়ে যেতে বাধ্য। ফলে সঙ্গত কারণেই নারী তার নারীত্ব হারিয়ে পুরুষালী মেজাজের হয়ে উঠবে। তখন তার লাগামহীন চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা সমাজের পক্ষেও সম্ভব হবে না। ফলে অহরহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হবে। যেমন এর বাস্তবতা আজ আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

নারীদেরকে আল্লাহ তাআলা মানব সন্তান উৎপাদনের যে পবিত্র কারখানা বানিয়েছেন, পর্দাহীনতায় ও অপস্পর্শে তা কলুষিত করলে, অপবিত্র করলে তা থেকে সন্তান উৎপাদন হবে ঠিকই, তবে ঐ সন্তানের মাঝে মানবীয় বৈশিষ্ট্য থাকবে না, থাকবে না নম্রতা-ভদ্রতা, মায়া-মমতা, ধৈর্য্য-সহনশীলতা ক্ষমা ও পরোপকারের ন্যায় মহৎ গুণগুলো।

পর্দা নারীর সম্ভ্রম রক্ষা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। দ্বীন ইসলামের এক অপরিহার্য, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় ও অবশ্য পালনীয় অমোঘ বিধান। পর্দাহীনতার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, এতে মানুষের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ চরিত্র ও নৈতিক আদর্শ ধ্বংস হয়ে যায়। পর্দাহীনতার কারণেই আজ অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নারী ধর্ষণ, পরকীয়া প্রেম, অবৈধ যৌনাচার, জারজ সন্তান জন্মদান, নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও সর্বোপরি নারী জাতীর নারীত্বের অবমাননা সারা বিশ্বে বিষ বাষ্পের ন্যায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

পর্দা হীনতার কারণেই সমাজের ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে ঘটছে মনোমালিন্য, চলছে অবাধ যেনা-ব্যভিচার। যুবক যুবতীরা অবৈধ মেলামেশায় তাদের মনুষ্যত্ব বোধ হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়ছে। আর

এ সকল বেহায়া অমানুষগুলোর দ্বারাই সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে চরিত্র বিধ্বংশী সব রকম শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি। তাদের দ্বারাই ব্লুফ্লিমসহ যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী নানা ধরণের চলচ্চিত্র তৈরী ও প্রদর্শন করা হচ্ছে। অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও বই পুস্তকে সারা দেশ ছেয়ে ফেলা হয়েছে।

পর্দাহীনতার আরেকটি মৌলিক ক্ষতি হলো, এর দ্বারা নারীদের আত্মমর্যাদার সুরম্য প্রাসাদ ধীরে ধীরে ধ্বসে পড়ে। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সম্পদ মায়ের জাতি নারীরা পরিণত হয় লোভী ও কামুক পুরুষদের ভোগের সামগ্রীতে। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যের নগ্ন ও অশ্লীল সমাজের অবলা সহজ সরল নারীদের পশুত্বের অমানবিক জীবন। যে দেশের নারীরা ছিল আদরের কন্যা, সতী সাধ্বী বোন, সুবোধ বধূ, গর্ভধারিনী মাতা, সতীত্ব-সম্ভ্রম ছিল যাদের মাথার তাজ, পর্দাহীনতার দরুণ তারা আজ দুশ্চরিত্র, লম্পট ও পাপী পুরুষদের টানা হেচড়ায় সীমাহীন পর্যায়ের অতিষ্ট, নানাবিধ অত্যাচার ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে নিষ্পেষিত।

ইমামুদ্দিন ইবনে কাসীর (র.) বলেন, নর-নারীর দৃষ্টি এমন সুতীক্ষ্ণ তীর যা হৃদয়কে ঘায়েল করেই ছাড়বে। এজন্যই বিজ্ঞানময় খোদা আপন আপন দৃষ্টিকে সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রাতের অন্ধকারে মুখোমুখি দুটি মোটর গাড়ীর হেড লাইটকে ক্ষনিকের জন্য না নেভালে যেমন নিশ্চিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে তেমনি নারী পুরুষ পরস্পর মুখোমুখী হয়ে দৃষ্টির তীক্ষ্ণ লাইট দুটি অবনত না করলে আশু বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। এ অশুভ ও অবৈধ দৃষ্টিপাত থেকে নারীর সুন্দর জীবনকে হেফাযতের জন্য শরীয়ত নর-নারীর প্রতি পর্দার বিধান জারি করেছে।

পর্দাহীনতার সিঁড়ি বেয়েই চরিত্রহীনতার যাত্রা শুরু হয়। আর চরিত্র হীনতার নিকষ অন্ধকার হতেই সমাজের চরম অবক্ষয় নেমে আসে। চরিত্রহীন অসভ্য ও বেহায়া যুবক যুবতী নিয়ে একটি সুখি সমৃদ্ধ ও শান্তিময় সমাজ গড়ার আশাটা কাঠের বাক্সে উইপোকা চাষেরই নামান্তর।

মোট কথা, সমাজ জীবনের সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি শৃংখলা নির্ভর করে

সুন্দর প্রজন্মের উপর। আর আগামী প্রজন্মকে সুশিক্ষা ও নৈতিক চারিত্রিক আদর্শে গড়ে তুলতে মায়ের পর্দার কোন বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে এক মনীষী কত সুন্দর কথাই না বলেছেন, “ পর্দাহীন নারীর গর্ভে সুসন্তান কামনা করা এরূপ অসম্ভব, যেমন প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ডে গোলাপ ফুল চাষ করা অসম্ভব ও অবাস্তব।”

পরিশেষে আমি সম্মানিত মা-বোনদের বিনীতভাবে বলছি, মহান আল্লাহ পাক আপনাদের দৈহিক অবয়বে যে সৌন্দর্য, আকর্ষণ, লাজুকতা ও পবিত্রতার মহা-সম্পদ দান করেছেন পর্দা রক্ষার মাধ্যমে সে মূল্যবান সম্পদকে পর পুরুষের কুদৃষ্টি, কুৎসিত কামনা বাসনা থেকে হেফাজত করুন। এতে উভয় জাহানে পাবেন অনাবিল শান্তি ও সুখ। সমাজকে উপহার দিতে পারবেন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এর ন্যায় অমূল্য- অমর মানব সন্তান। মনে রাখবেন, লক্ষ কোটি বখাটে ও খারাপ সন্তানের চেয়ে একটি সৎ নিষ্ঠাবান ও প্রকৃত সন্তান এ জগত জাহানে অধিক মর্যাদাশীল ও উপকারী। আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তাওফীক দিন। আমীন। ❐

একটি হৃদয়বিদারক কাহিনী

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর কট্টর হিন্দুদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের ভয়ে পূর্ব পাঞ্জাবের বহু এলাকায় অনেক মুসলমান মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এ সংবাদ হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহ.) এর নিকট পৌঁছলে তিনি ভীষণভাবে মর্মাহত হন। ভাবতে থাকেন, হায়! যদি এ লোকগুলো এভাবেই মারা যায় তাহলে তাদের পরিণতি কতইনা ভয়ংকর হবে। তারা তো চিরকালের জন্য জাহান্নামী হয়ে যাবে। কোন দিন তারা জান্নাতের নাম গন্ধও পাবে না। তাই এসব মুরতাদকে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যায় এ নিয়ে তিনি সর্বদাই চিন্তা ফিকিরে মশগুল থাকতেন এবং অন্যান্য মুরব্বীদের সাথে পরামর্শ করতেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ সালে তিনি

দিল্লীর নিযামুদ্দীন মার্কাজে এ ব্যাপারে একাধারে ৮দিন বয়ান রেখে ২২জনের দুটি জামাত তৈয়ার করলেন এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় হিদায়েত দিয়ে নির্দিষ্ট এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন।

প্রত্যেক জামাতে ১১ জন করে সাথী ছিল। উভয় জামাত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে প্রথমে পানিপথে এসে পৌঁছে এবং সেখান থেকে পরামর্শক্রমে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় মেহনত করার পর চিল্লাপুর নামক স্থানে পুনরায় একত্রিত হয়।

চিল্লাপুরে মোট ৫টি মসজিদ ও ১২টি মুসলিম পরিবার ছিল। হিন্দুদের ভয়ে সবাই ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। (নাউযুবিল্লাহ) শুধু তাই নয়, ভারতের উগ্রবাদী নরপশুদের নিষ্ঠুর হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা মসজিদের মিম্বর ভেঙ্গে সেখানে মাটির তৈরী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছিল। এরপর সেখানে শুরু হয় পূঁজা-অর্চনা। আল্লাহু আকবার! অবস্থা কতটা নাজুক হলে পর মুসলমানরা নিজেরাই মূর্তি নির্মান করে তার পূঁজা অর্চনায় লিপ্ত হতে পারে। প্রিয় পাঠক! এ থেকে আপনারা হয়তো এলাকার পরিস্থিতিটা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছেন।

জামাতের জিম্মাদার ছিলেন হাজী কামালুদ্দীন সাহারানপুরী সাহেব। তিনি বলেন, আমরা চিল্লাপুরে এক সপ্তাহ কাজ করার পর 'জীয' নামক এলাকায় চলে যাই। সেখানকার পরিস্থিতি ছিল আরও মারাত্মক। সেখানে মুসলমান ছিল প্রচুর সংখ্যক। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। যারা বাকী ছিল তাদের কেহই প্রকাশ্যে নামায পড়ার সাহস পেত না। লুকিয়ে লুকিয়ে গোপনে নামায আদায় করে নিত। সেখানে পৌঁছার পর তাদের পাঁচজন আমাদের সাথে জুড়ে যায় এবং একটু সাহস সঞ্চয় করে আযান দিয়ে নামাজ পড়তে আরম্ভ করে।

আমরা সেখানে মোট ৪দিন কাজ করলাম। ৪র্থ দিন পুলিশের নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, এ এলাকায় এমন একদল লোকের আগমন ঘটেছে যারা মুরতাদ্দেরকে পুনরায় মুসলমান বানিয়ে নিচ্ছে। ব্যাস, আর দেরী নাই। সংবাদ পৌছার সাথে সাথে ২০ সদস্যের একটি পুলিশ দল ট্রাকে আরোহন করে দ্রুত আমাদের কাছে এসে পৌছল।

তারা মসজিদে প্রবেশ করে কোনরূপ কথা-বার্তা ছাড়াই আমাদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে দিল। প্রথমে তারা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে করতে হাতের লাঠি ও বন্দুকের বাট দিয়ে আমাদেরকে বেধরক পেটাল। তারপর একজন সাথীর উপর তিন চারজন পুলিশ উঠে বুট জুতো দিয়ে মাড়াতে লাগলো। তাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাত্রা এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, সাথীরা দাঁতে দাঁত চেঁপেও তা বরদাশত করতে পারছিল না। এসব মানবরূপী হায়েনাদের বুট ও লাঠির আঘাতে আমাদের সকলের দেহই ক্ষত বিক্ষত হল। শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝড়তে লাগলো। কারো কারো মাথা ফেটে ফিনকী দিয়ে রক্ত ছুটলো। আল্লাহর পবিত্র ঘর মসজিদ অল্পক্ষণের মধ্যে লালে লাল হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, নিষ্ঠুর নরপশুগুলোর নিমর্ম আঘাতে আমাদের সকলেই মলমূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হল। শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে আমরা সবাই জ্ঞান হারিয়ে বেঁহুশ হয়ে যাই।

যখন আমাদের জ্ঞান ফিরল তখন নিজেদেরকে একটি অন্ধকার সংকীর্ণ প্রকোষ্টে আবদ্ধ দেখতে পেলাম। এভাবে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলো। কিন্তু এ নরাধমগুলো তখন পর্যন্ত আমাদেরকে একদানা খাবার কিংবা এক ফোটা পানিও পান করতে দেয়নি। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে দেহের প্রচন্ড ব্যাথা নিয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় জিকির করতে করতে রাত কাটিয়ে দিলাম।

সকাল বেলা আমাদের উপর শুরু হল নির্যাতনের আরেক পর্যায়। অত্যন্ত শক্ত ভাষায় আমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হল যে, জেলখানার সমস্ত কয়েদীদের পায়খানা তোমাদেরকেই পরিস্কার করতে হবে। নির্দেশ পালনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করলে ভয়ংকর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

আমরা বাধ্য হয়েই তাদের নির্দেশ পালন করলাম। এভাবে তিনদিন কেটে গেল। এ কয়দিনেও আমাদের কোন দানাপানি জোটেনি। আমরা প্রতিদিন মহান আল্লাহর দরবারে এ মৃত্যুপুরী থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য এ বলে দোয়া করতাম যে, হে খোদা! আমরা কেবল তোমাকে রাজী

খুশি করার উদ্দেশ্যে তোমার দ্বীনের মেহনত নিয়ে বাড়ীঘর, ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন সবাইকে ত্যাগ করে তোমার রাস্তায় বের হয়েছি। পাষন্ড হিন্দুরা আমাদের সাথে কি বর্বর ও অমানবিক আচরণ করছে তা তুমি ভাল করেই দেখছ খোদা! হে খোদা! তুমি মেহেরবাণী করে আমাদেরকে এ আজাব থেকে মুক্তি দাও।

চতুর্থ দিন আমরা জেলখানার একটি কামরায় বসে তালীম করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ করে একজন অফিসার কামরায় প্রবেশ করে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি করছিলে? জবাবে আমরা বললাম, আমরা তালীম করছিলাম। অতঃপর তাকে তালীমের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ইত্যাদি খুলে খুলে বর্ণনা করলে তিনি আমাদের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং তালীমের কিতাবখানা হাতে নিয়ে অল্প কিছুক্ষণ পড়লেন।

তারপর ভাবনার অথৈ সাগরে হারিয়ে গেলেন তিনি। আমরা সবাই তার মুখপানে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি বলতে লাগলেন, আমি যখন মুলতান ছিলাম তখন আমরা শিশুদের কোন রোগব্যাধি হলে তাদেরকে মুসলমানদের নিকট নিয়ে যেতাম। তারা তোমাদের মতই মুসলমান ছিলেন। তাদেরকে বলা হত তাবলীগ জামাতের লোক। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে তোমরা তাদেরই দলভূক্ত। সেসব মুসলমান আল্লাহর কালাম পড়ে বাচ্চাদের উপর দম করলে সাথে সাথে তারা সুস্থ হয়ে যেত। তারা অত্যন্ত ভাল লোক ছিলেন। ধীরে ধীরে তাদের সাথে আমার বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। যাহোক, তোমাদের কোন কষ্ট হলে আমাকে অবশ্যই জানাবে।

অফিসারের কথা শেষ হলে আমরা তার নিকট আমাদের পূর্ণ অবস্থা তুলে ধরলাম। এতে তিনি খুবই দুঃখ বোধ করলেন এবং সাথে সাথে জেলখানার দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কড়া নির্দেশ দিয়ে বললেন, সাবধান, এদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় সেদিকে তোমরা সবাই নযর রাখবে। এদের জন্য ভাল খাবার এবং বড় একটি রুমের ব্যবস্থা করে দিবে। এ ধরণের আরো কিছু নির্দেশ দিয়ে তিনি আমাদের সাথে মোসাফাহা করে বিদায় নিলেন।

তারপর থেকে আমাদের আর কোন অসুবিধা রইল না। উপরন্ত আমরা জেলখানার মুসলমান কয়েদীদের উপর এতবেশী মেহনত শুরু করে দিলাম যে, অল্প দিনের মধ্যে ৮০ জন মুসলমান আমাদের সাথে নামাজ পড়তে আরম্ভ করল। এভাবে ১৮দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের সবাইকে মুক্তি দেয়া হল।

জেলখানা থেকে মুক্তি লাভের পর আমরা বুড়িয়া অঞ্চলে চলে গেলাম। সেখানে কয়েকদিন কাজ করার পর আমরা আরুতী নামক স্থানের একটি অনাবাদী মসজিদে আশ্রয় নিলাম। সে অঞ্চলে তখন পাকিস্তান থেকে আগত শিখরা বসবাস করছিল। সংবাদ পেয়ে তারা কালবিলম্ব না করে বন্দুক রাইফেল ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হল। তারপর ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো, তোমরা মুসলমানরাই আমাদের শিখ ও হিন্দু ভাইদের পাকিস্তানে হত্যা করেছ। এবার প্রতিশোধ নেয়ার পালা। আমরা তোমাদেরকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করে মনের ঝাল মিটাবো। সুতরাং দেরী না করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

আমরা বললাম, তোমরা আমাদের হত্যা করে শহীদ করে দিবে। তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে দয়া করে মৃত্যুর পূর্বে আমাদেরকে দু'রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দাও। এটিই আমাদের একমাত্র অনুরোধ।

তারা আমাদের অনুরোধ রক্ষা করতে রাযী হল। আমরা জীবনের শেষ নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে খোদার দরবারে ফরিয়াদ জানালাম। আমরা দু'রাকাত নামায একটু ধীরস্থিরভাবে শেষ করি এটা বর্বর পাষন্ডদের কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না। তাই তারা নামায শেষ করার পূর্বেই অত্যন্ত নির্মমভাবে আমাদের উপর গুলি চালাতে লাগলো। আমাদের তাজা খুনে সমস্ত মসজিদ রক্তে ভেসে গেল। গগণ ফাটা আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হল। কিন্তু মানবরূপী হায়েনাগুলোর হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও দয়ার উদ্রেক হল না।

তাদের গুলির প্রচন্ড আঘাতে আমাদের পাগুলো ছিদ্র হয়ে গেল। আমরা জ্ঞান হারানোর পূর্বে খোদায়ী মদদ প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম,

আপনা আপনিই তাদের বন্দুকগুলো অকেজো হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করে আর একটি গুলিও তারা ছুড়তে পারল না।

এ অপ্রত্যাশিত কান্ড প্রত্যক্ষ করে তারা দৌড়ে এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি মন্ত্র পড়ছিলে যার ফলে আমাদের গুলি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেল? প্রতি উত্তরে আমরা বললাম, আমরা কোন মন্ত্র পড়িনি, মন্ত্র জানিও না। আমরা তো রাব্বুল আলামীনের কালাম পাঠ করছিলাম যার হাতে আমাদের জান। যিনি আমাদের রক্ষা কর্তা, পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। যার কাছে আমাদের তোমাদের এবং দুনিয়ার সকল মানুষের অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। আমাদের জবাব শুনে তারা নির্বাক হয়ে চলে গেল।

এরা চলে যাওয়ার পর আমরা সবাই কাপড় পুড়িয়ে ছাই দিয়ে জখমের স্থানগুলো ভর্তি করলাম। রক্তাক্ত দেহ নিয়ে সারারাত কাতরাতে কাতরাতে এভাবেই কাটিয়ে দিলাম। সকালে দেখলাম, গতকালের এক আক্রমনকারী একজন ডাক্তার নিয়ে আমাদের নিকট আসল। ডাক্তার অত্যন্ত যত্নের সাথে আমাদের জখমগুলো ধুয়ে মুছে পরিস্কার করল এবং তাতে ঔষধ লাগিয়ে পট্টি বেধে দিল। এতে আমরা অনেকটা আরামবোধ করলাম।

ডাক্তারের কাজ শেষ হওয়ার পর শিখ লোকটি আমাদের সবাইকে দুধ পান করাল। তারপর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলল, ভাইগণ! আপনারা আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরা না বুঝে আপনাদের সাথে এরূপ দুঃখজনক আচরণ করেছি। এতে আমাদের মহা অন্যায় হয়ে গেছে। জবাবে আমরা বললাম, আপনারা যেহেতু না বুঝে এরূপ করেছেন এজন্য আল্লাহ্ আপনাদের ক্ষমা করুন। আমরাও আপনাদের ক্ষমা করে দিলাম।

অত্র এলাকায় আরো কয়েকদিন কাজ করার পর আমাদের জামাত খিযিরাবাদ জামে মসজিদে পৌঁছল। সেখানে যেতে না যেতেই একদল পুলিশ এসে আমাদের সবাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল এবং সেখানকার একটি বিশাল পরিত্যক্ত বাড়ীতে আবদ্ধ করে রাখল।

বাড়ীর ভিতর একটি পুতি দুর্গন্ধময় কুয়া ছিল। ভারত বিভাগ

যেভাবে বইটি সাজানো

আন্দোলনের সময় কট্টর হিন্দুরা একযোগে আক্রমন চালিয়ে অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করে তাদের লাশগুলো উক্ত কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। পিপাসায় আমাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাওয়ায় এই কুয়ার পঁচাগলা দুর্গন্ধযুক্ত পানিই বাধ্য হয়ে আমাদের পান করতে হয়েছিল।

পুলিশ বাহিনীর লোকদের যখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, আমরা মারা গেছি তখন তারা আমাদের লাশগুলোকে উল্লেখিত কুপে ফেলে দেওয়ার জন্য দরজা খুলল। কিন্তু এতদিন পরও আমাদেরকে জীবিত দেখতে পেয়ে তারা সীমাহীন আশ্চার্যান্বিত হল। ভাবল, তারা কি মানুষ না অন্য কিছু। মানুষ হলে তো এই ময়লা আবর্জনাপূর্ণ বাড়ীতে দানা পানি না খেয়ে কোন মানুষ বাঁচতে পারে না। খোদার কি অপার মহিমা, শেষ পর্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তারা আমাদেরকে নাহান নামক পাহাড়ী এলাকায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

নাহান এলাকায় আমরা একাধারে ১৫দিন দ্বীনি মেহনত চালালাম। এতে অসংখ্য মুরতাদ তাদের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুনাফিক আমাদের সম্পর্কে নানাবিধ অভিযোগ তুলে পুলিশের নিকট রিপোর্ট পেশ করল।

রিপোর্ট পাওয়ার পর পুলিশ বিন্দুমাত্রও সময় নষ্ট না করে আমাদের নিকট হাযির হল। তারা প্রথমে আমাদের হাত পা বেধে গাড়ীতে তুলে নিল। তারপর শুরু করল অমানবিক নির্যাতন।

গাড়ীতে উঠানোর পর গাড়ী দ্রুত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল। পথিমধ্যে তারা আমাদের কাপড় চোপড় খুলে বিবস্ত্র করে আচ্ছামত পেটাতে থাকলো। পাশাপাশি কিল ঘুষি, লাথি, চপেটাঘাত ও অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ তো আছেই। এভাবে দীর্ঘক্ষণ চলার পর গাড়ীটি একটি বিরাট ব্রিজের উপর এসে দাঁড়ালো। আমরা সকলেই তখন বুঝলাম যে, এক্ষনিই আমাদেরকে যমুনা নদীর বিশাল বক্ষে ক্ষুদ্র পাথরের ন্যায় ছুড়ে মারা হবে এবং সেখানেই আমাদের সলিল সমাধি হবে। তাই আমরা মনে মনে আল্লাহর জিকির করতে লাগলাম। দোয়া করলাম, হে আমাদের প্রভূ! যেমনিভাবে তুমি অতীতের নানাবিধ বিপদ আপদ থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে এনেছ ঠিক তেমনি আজও আমাদের

বাঁচাও। তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই।

গাড়ীটি ব্রিজের উপর উঠার পর তারা আমাদের সবাইকে গাড়ী থেকে নামাল। তারপর একজন একজন করে যমুনার বিশাল তরঙ্গমালায় ছুড়ে ফেলতে আরম্ভ করল। আমাদেরকে যখন নদীতে ছুড়ে ফেলা হল তখন নদীর সুবিশাল ঢেউয়ের পেটে তলিয়ে আমরা আবার যখন উপরের দিকে উঠি তখন পানি আর আকাশ ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছিল না। আমাদের প্রায় সব সাথীরাই তখন বেহুঁশ ছিল।

আমরা বিরামহীন ভাবে পানির স্রোতে ভেসে চলেছি। কিন্তু আল্লাহর কি কুদরত! হঠাৎ দেখি ডাল-পালাসহ মূল থেকে উপড়ানো একটি বাবলা গাছ আমাদের সামনে ভেসে যাচ্ছে। ঢেউয়ের তোড়ে আমরা সবাই উক্ত গাছের ডাল পালায় এসে আটকে যাই। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চললাম। কিছুদূর যাওয়ার পর আমি বললাম, চলুন আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে গাছের উপর নির্ভরতা ছেড়ে দিয়ে তীরের দিকে এগিয়ে যাই। একথা বলতে না বলতেই একখানা বিশাল ঢেউ এসে আমাদের সবাইকে গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। আমরা একে অপরকে হারিয়ে ফেললাম। এরপর কি হল তা আমরা কিছুই বলতে পারবো না। কারণ আমরা তখন পুনরায় বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। যখন আমাদের জ্ঞান ফিরল তখন দেখলাম, আমরা সবাই বিবস্ত্র অবস্থায় একটি বালুকাময় প্রান্তরে পড়ে আছি। নাক, কান, চোখ মাটিতে ভর্তি। আমরা ধীরে ধীরে মাটিগুলো হাত দিয়ে পরিস্কার করলাম।

শুক্রবার দুপুর ১২টা। আমাদেরকে নদীতে ফেলা হয়েছিল বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার সময়। এ হিসাবে প্রায় ২৪ ঘন্টা আমরা নদীতে ছিলাম। আমাদের জখমের চিহ্নগুলো দীর্ঘক্ষণ পানিতে থেকে সাদা স্যাঁত স্যাঁতে হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক তখন আমাদের ইযযত আবরুর হেফাযতের ব্যাপারেও নুসরত করেছিলেন। কারণ নদীতে ফেলার সময় আমাদের সবাইকে বিবস্ত্র করেই ফেলা হয়েছিল। তবে ঐ সময় একজন মাত্র সাথীর কোমরে একটি কাপড়ের পুটুলী বাধা ছিল। পুলিশ তাকে ঐ অবস্থায়ই নদীতে ফেলেছিল। নদী থেকে কিনারায় উঠার পর দেখা গেল উক্ত সাথীর কোমরে তখনো কাপড়ের পুটুলি বাধা

আছে। তাতে মোট ৪টি কাপড় ছিল। আমরা সেগুলো টুকরো টুকরো করে ইযযত ঢাকার ব্যবস্থা করলাম।

আমরা জুমআর নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে খিযিরাবাদ জামে মসজিদে এসে পৌঁছলাম। নামায আদায়ের পর একদল পুলিশকে মসজিদের দরওয়াজায় দেখতে পেলাম। পুলিশ দেখে মুসুল্লিরা ভয় পেয়ে গেল। তারা সকলেই বলতে লাগলো, এই নতুন লোকগুলির জন্যই আমরা বিপদে পড়তে যাচ্ছি। আল্লাহই জানেন আমাদের ভাগ্যে কি আছে?

পুলিশ বাহিনীর মধ্যে বেশ কয়েকজন ইন্সপেক্টর ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম হল কর্তা সিং। তিনি মসজিদের ভিতরে সবাইকে একত্র করে বসালেন। তারপর আমাদেরকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলার কাহিনী সকলকে শুনালেন। অতঃপর বললেন, আমরা এদের উপর অনেক জুলুম করেছিলাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল, এভাবে এরা নদীতে ডুবে মারা যাবে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরা কেউ মারা যায়নি। নিশ্চয়ই এদের পিছনে কোন মহাশক্তি আছে, যে তাদেরকে সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করছে। যে মহাশক্তি এদের রক্ষা কর্তা, যিনি তাদের হেফাজতের মালিক আমি সেই গায়েবী শক্তির উপরই ঈমান আনতে চাই। একথা বলে তিনি মুসলমান হওয়ার পূর্ণ আগ্রহ ব্যক্ত করলে সেখানকার ইমাম ও এলাকার জিম্মাদার মুহাম্মদ তকী সাহেব তাকে গোসল করিয়ে কালেমা শরীফ পড়ালেন এবং পরিপূর্ণ রূপে ইসলামে দাখেল করলেন। অতঃপর ইন্সপেক্টর আমাদের বললেন, এখন থেকে আপনারা এখানে স্বাধীন-মুক্ত। যেভাবে খুশি আপনারা কাজ চালিয়ে যান।

ইন্সপেক্টর সাহেবের ইসলাম গ্রহণের পর তার সাথে আরো অনেক শিখ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিল। অনেক মুরতাদও পুনরায় ইসলামে ফিরে এল। শিখরা আমাদের জন্য অনেক দামী দামী পোষাক নিয়ে আসল। তৃপ্তি সহকারে বিভিন্ন প্রকার খানা খাওয়াল। দুধ, মিষ্টি এবং নানাবিধ ফলমূল তো আছেই। বড় ইযযত ও সম্মানের সাথে আমরা সেখানে কয়েকদিন থেকে নিযামুদ্দিনে চলে এলাম।

এ সফরে আমাদের সর্বমোট সাড়ে পাঁচ মাস সময় লেগেছিল।

আমরা নিযামুদ্দিনে এসে হযরতজী (রহ.) এর নিকট যাবতীয় ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিলে তিনি তা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং অন্তর থেকে প্রাণ খুলে আমাদের জন্য দোয়া করেন।

এ মর্মস্পর্শী ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করে আল্লাহপাক তাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। এটি মহান আল্লাহ তায়ালার অঙ্গিকারও বটে। যেমন তিনি সূরা মুহাম্মদের ৭নং আয়াতে বলেন, ‘তোমরা যদি আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর তবে আল্লাহপাকও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং শত্রুর মোকাবেলায় তোমাদের দৃঢ়পদ রাখবেন।’ ❒

অপূর্ব বদান্যতা

নিঝুম রাত। রাতের আধার যেন পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে। সন্ধ্যার পর যে চাঁদটি উদিত হয়েছিল তাও বিদায় নিয়েছে অনেক আগেই। শুধু জোনাক জ্বলা আলো নিয়ে আকাশে জেগে আছে তারার মিছিল।

প্রিয়নবী (সা.) এর প্রিয় দৌহিত্র হাসান ও হোসাইন (রা.)। ক'দিন যাবত তারা ভীষণ অসুস্থ। হযরত আলী ও ফাতেমা (রা.) খুবই পেরেশান। ছেলেদের রোগমুক্তির জন্য যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাও করলেন তারা। কিন্তু কোন ফল হলো না। তাদের রোগ দিন দিন আরো বাড়তে লাগলো।

রাত গভীর হওয়ায় সকলেই শুয়ে পড়েছে। ঘুম নেই কেবল হযরত আলী ও ফাতেমা (রা.) এর চোখে। তারা ভীষণ চিন্তিত। পুত্রদ্বয়ের আরোগ্যের জন্য কি করা যায় এ নিয়েই তাদের যতসব ভাবনা। শেষ পর্যন্ত তারা পরামর্শ করলেন। উভয়ে মিলে একটা সিদ্ধান্তে পৌছলেন।

সিদ্ধান্ত হল, যদি আল্লাহ তায়ালা হাসান ও হোসাইন (রা.) কে সুস্থ করে দেন তাহলে শুকরিয়া হিসেবে তারা প্রত্যেকে তিনটি করে মান্নতের রোজা রাখবেন।

মান্নত করার পর বেশী দিন অপেক্ষা করতে হল না। অল্প দিনেই তারা সুস্থ হয়ে গেল।

এবার মান্নত পূর্ণ করার পালা।

হযরত আলী ও ফাতেমা (রা.) রোজা রাখতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, সেহরী কিংবা ইফতারের জন্য কোন খাবার ছিল না। ফলে না খেয়েই তাদেরকে রোযা রাখা শুরু করতে হলো।

সকাল বেলা। হযরত আলী (রা.) চললেন এক ইহুদীর উদ্দেশ্যে। অনেক দূর হেঁটে এক সময় তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, ইহুদীকে লক্ষ্য করে-

ঃ তোমার কোন কাজ আছে?

ঃ হ্যাঁ, আছে। ইহুদী জবাব দিল।

ঃ কি কাজ?

ঃ পশম দিয়ে সূতা বানানোর কাজ।

ঃ পারিশ্রমিক দিলে মুহাম্মদ (সা.) এর বেটি এ কাজ করার জন্য প্রস্তুত।

ঃ ঠিক আছে। এক বান্ডেল সূতা কাটলে তিন ছা যব দেয়া হবে। তোমরা কি তাতে রাজী আছ?

ঃ হ্যাঁ, আমরা রাজি আছি।

ইহুদীর সাথে কথাবার্তা শেষ করে হযরত আলী (রা.) এক বান্ডেল পশম নিয়ে বাড়ীতে ফিরলেন। বললেন, স্ত্রী ফাতেমা (রা.) কে উদ্দেশ্য করে-ফাতেমা! তোমার জন্য কাজ পেয়েছি। ফাতেমা (রা.) খুশি হলেন। কি কাজ করতে হবে তাও স্বামী থেকে ভালভাবে বুঝে নিলেন। তারপর বিলম্ব না করে কাজ শুরু করে দিলেন।

সারাদিন কাজ করে রাসুল (সা.) এর আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) এক তৃতীয়াংশ সূতা কাটলেন। বিনিময়ে পেলেন এক ছা (সাড়ে তিন সের) যব।

ঘরের সদস্য সংখ্যা মোট পাঁচ জন। স্বামী-স্ত্রী হাসান, হোসাইন ও

ফিদ্দা নামীয় এক বাদী। হযরত ফাতেমা (রা.) বাদীর সহযোগীতায় যব পিষে পাঁচ জনের জন্য পাঁচটি রুটি বানালেন। রুটি বানাতে বানাতে ইফতারের সময় হয়ে গেল।

সারাদিন না খেয়ে কঠোর পরিশ্রমের পর হযরত ফাতেমা (রা.) সবাইকে নিয়ে ইফতার করতে বসলেন। রুটি টুকরো করে মুখে দিবেন ঠিক এই মুহূর্তে জনৈক ফকীর এসে হাক ছেড়ে বলল,

হে মুহাম্মদ (সা.) এর পরিবারের লোকজন! আমি অভুক্ত, ক্ষুধার্ত। আমাকে খানা খাওয়াও। আল্লাহপাক তোমাদেরকে জান্নাতের দস্তরখানে খানা খাওয়াবেন।

রুটি আর মুখে দেয়া হল না। সকলেই হাত নিচে নামিয়ে ফেললেন। হযরত আলী (রা.) স্ত্রী ফাতেমা (রা.) এর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। ফাতেমা (রা.) সবই বুঝলেন। বললেন, দেরী করার প্রয়োজন নেই। এক্ষুনিই দিয়ে দিন।

হযরত আলী (রা.) রুটিগুলো ফকীরকে দিয়ে দিলেন। ফকীরের ক্ষুধা দূর করতে গিয়ে সবাই ভুখা অবস্থায় রাত্রি যাপন করলেন।

আজ দ্বিতীয় দিন। ঘরে খাবারের কিছুই নেই। ফলে প্রথম দিনের মত আজও না খেয়েই রোজা রাখতে হল।

নবী নন্দিনী ফাতেমা (রা.) আবার সূতা কাটা শুরু করলেন। দিনভর এক তৃতীয়াংশ সূতা কেটে বিনিময়ে পেলেন এক ছা যব। এই যব পিষে গতকল্যের ন্যায় আজও পাঁচটি রুটি বানালেন।

ইফতারের সময় সকলেই খেতে বসলেন। ইত্যবসরে একজন এতিম বসে নিজের অসহায় অবস্থা ও অভাবের কথা জানাল। একজন এতীমকে অভূক্ত রেখে তারা খানা খেতে পারলেন না। ফলে সেই দিনের রুটিও এতীমের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা উপবাসে কাটালেন।

তৃতীয় দিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় তারা আবার রোজা রাখলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) শেষ তৃতীয়াংশ সূতা কেটে পারিশ্রমিক হিসেবে পাওয়া এক ছা যব দিয়ে রুটি বানালেন। অতঃপর সন্ধ্যা বেলা ইফতার করতে বসার পর আজও একজন কয়েদী এসে হাক ছেড়ে বলল, আমি বড়ই

অসহায়। আমার খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই। দয়া করে আমাকে কিছু খাবার দিন।

কয়েদীর কথা শুনে তাদের চোখে পানি এসে গেল। হৃদয়ের গহীন কোনে জেগে উঠল এক রাশ সহানুভূতি। ভাবলেন, আমরা খাবার খাব আর এ অসহায় লোকটি না খেয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করবে তা কিছুতেই হতে পারে না। সুতরাং কালবিলম্ব না করে ঐ দিনের রুটিগুলোও কয়েদীর হাতে উঠিয়ে দিলেন এবং ভীষণ ক্ষুধা নিয়ে রাত কাটালেন।

চতুর্থ দিন সকাল বেলা রোযা তো ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু মুখে দেয়ার মত এক লোকমা খাবারও ঘরে ছিল না। হযরত আলী (রা.) দুই ছেলেকে নিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য রওয়ানা দেন। দুর্বলতা হেতু কেউই ভাল করে চলতে পারছিলেন না। অবশেষে বহু কষ্টে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে অবস্থা বর্ণনা করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কষ্টে আমারও কষ্ট হচ্ছে। চল ফাতেমার নিকট যাই। সেখানে গিয়ে দেখেন যে, হযরত ফাতেমা (রা.) নামায পড়ছেন। ক্ষুধার তাড়নায় চোখের নীচে দাগ পড়ে গেছে। পেট কোমরের সাথে লেগে গেছে। দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং হক তাআলার দরবারে ফরিয়াদ জানালেন।

সাথে সাথে হযরত জীব্রাইল (আ.) নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন।

"তাদের নিকট খাবার পছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও মিসকিন, এতীম ও কয়েদীদেরকে উহা খাওয়াইয়া দেয়।"

নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অন্যের প্রয়োজনকে অধিক গুরুত্ব দেয়াই হোক এই ঘটনার মূল শিক্ষা। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের তাওফীক দান কর। ❒ (ফাযায়েলে ছাদাকাত)

একটি মর্মান্তিক কাহিনী

পবিত্র রমজান মাসের পড়ন্ত বিকেল। মুসলিম গৃহিনীরা ইফতারী তৈরীতে ব্যস্ত। কিশোরী মেয়েরাও মাকে ইফতারীর আয়োজনে বিভিন্ন প্রকার সহযোগীতা করে যাচ্ছে। একটু পরেই মাগরিবের আযান হবে। সারাদিন রোজা রেখে সন্ধ্যা সময় সকলে একত্রে মিলে ইফতারী করার মজাটাই আলাদা।

কিন্তু এ আনন্দঘন মুহূর্তেও একটি হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটে যায় পাকিস্তানের একটি অভিজাত পরিবারে। খোদায়ী নির্দেশকে অমান্য করে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি বোধ হয় এমনই হয়ে থাকে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

ঘটনা হলো, একদা ইফতারের কিছুক্ষণ পূর্বে মা মেয়েকে সম্বোধন করে বললেন, বেটি! ইফতারী তৈরীর কাজে আমাকে একটু সহযোগীতা কর। জবাবে মেয়ে বললো, এ মুহূর্তে আপনাকে সাহায্য করা আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। কারণ এখন টিভিতে একটি প্রোগ্রাম আছে। এটি আমাকে দেখতেই হবে। প্রোগ্রাম শেষ হলে সহযোগীতা করার চেষ্টা করবো। মেয়ের কথা শুনে মা আর কথা বাড়ালেন না। তিনি বাধ্য হয়ে একাই ইফতারীর এন্তেজাম করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

মেয়ে তার বক্তব্য শেষ করে টেলিভিশনের কক্ষে চলে গিয়েছিল। মা আবার এসে জোর করে তাকে নিয়ে যান কিনা এই ভয়ে সে ভিতর দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। অতঃপর টেলিভিশন অন করে দিয়ে মহাআনন্দে প্রোগ্রাম দেখতে লাগলো।

টেলিভিশন কক্ষে মেয়েটি একাই ছিল। এদিকে ইফতারী শেষে মাগরিবের নামায আদায় করার পরও যখন মেয়ে রুম থেকে বের হলো না তখন মা তাকে ডাকতে লাগলেন। খুব জোড়ে দরজায় আওয়াজ দিলেন কিন্তু মেয়ের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। এভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর মায়ের মনে এক অজানা আশংকা জমাট বাধতে লাগলো। তিনি পেরেশান হয়ে বাড়ীর পুরুষদের নিকট ঘটনা খুলে বললেন। তাদের কাছেও ব্যাপারটি বড়

অস্বাভাবিক মনে হলো। অবশেষে তারাও সেখানে গিয়ে মেয়েটির নাম ধরে বারবার উচ্চ আওয়াজে ডাকল। কিন্তু এতেও কোন ফল হল না। মনে হল, ভিতরে যেন কোন প্রাণীর অস্তিত্বই নেই। ফলে তাদের আশংকা আরো তীব্র হলো।

শেষ পর্যন্ত উপয়ান্তর না দেখে তারা দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলো। ভিঁতরের দৃশ্য দেখে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তারা দেখলো, মেয়েটি উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। দেহে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। চলে গেছে এমন এক জগতে যেখান থেকে কোনদিন সে ফিরতে পারবে না।

এরপরের ঘটনা আরোও হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক। গোসল দেওয়ার জন্য শত চেষ্টা করেও তারা আপন স্থান থেকে মেয়েটিকে বিন্দুমাত্রও উপরে উঠাতে পারলো না। দুটি লৌহদন্ডকে গলিয়ে একটিকে অপরটির সাথে লাগিয়ে দিলে যেমন শক্ত ও মজবুতভাবে আটকে থাকে ঠিক তেমনি মেয়েটির লাশও ঘরের মেঝের সাথে আটকে রয়েছে। কিছুতেই তাকে নড়ানো সম্ভব হলো না।

এ অবিশ্বাস্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক। ঠিক এমন সময় তাদেরই একজন বুদ্ধি করে টিভিটা আলগে ধরে উপরে উঠিয়ে নেয়। সাথে সাথে মেয়েটিও মাটি থেকে আলগা হয়ে যায়। টিভিটি মাটিতে রেখে দিলে মেয়েটিও আবার পূর্বের মতো ফ্লোরের সাথে আটকে যায়। তাকে উঠানো সম্ভব হয় না। এভাবে বারবার করার পর শেষ পর্যন্ত তারা বুঝল যে, তাকে বের করতে হলে টিভিসহই বের করতে হবে। অন্যথায় বের করা সম্ভব নয়।

অবশেষে তাই করা হল। তারা টিভিসহ মেয়েটিকে উঠিয়ে নিচে নিয়ে গোছল দিয়ে কাফন পরিধান করালো।

এবার জানাযার জন্য লাশ মসজিদের মাঠে নিয়ে যাওয়ার পালা। কিন্তু সেখানেও একই সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় টিভিসহই লাশ নিতে হল। অনুরূপভাবে বাধ্য হয়েই লাশটিকে টিভিসহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হল।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। মেয়েটিকে কবরে দাফন করে ঘরে নিয়ে আসার জন্য যেইমাত্র টিভিটি তুলে নেয়া হলো অমনি মেয়েটির লাশও কবর থেকে উঠে বাইরে ছিটকে পড়লো। তারা লাশটিকে পুনরায় দাফন করে টিভি তুলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাশটি আবারও কবরের বাইরে চলে আসলো। অগত্যা কি আর করা! শেষ পর্যন্ত তারা অপারগ হয়ে টিভিসহ মেয়েটিকে দাফন করে বাড়ীতে ফিরে এলো। পরে মেয়েটির ভাগ্যে কি জুটেছে আল্লাহই তা ভাল জানেন। ❐

(সূত্র ঃ সাপ্তাহিক খতমে নবুওয়াত, পাকিস্তান। সংখ্যা ঃ ১৮ বর্ষ ঃ ৭)

আরেকটি ভয়াবহ ঘটনা

অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু। উভয়ের বসবাস সৌদী আরবেই। তবে একজন জিদ্দায়, অপরজন রিয়াদে। দু'জনই দ্বীনদার, পরহেযগার। আল্লাহ পাকের হুকুম এবং রাসুল (সা.) এর নূরানী জিন্দেগী নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য উভয়েই সমানভাবে সচেষ্ট। দু'জনের সততার সুনামও ছিল চারিদিকে।

রিয়াদে বসবাসকারী বন্ধুর পরিবারের লোকজন ছিল একটু মর্ডান টাইপের। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এ লোকগুলোর মধ্যে দ্বীনদারী ও খোদাভীতির মাত্রা একটু কমই ছিল। একদা তারা সকলে মিলে জেদ ধরল যে, বর্তমান জামানায় টেলিভিশন ছাড়া চলা মুশকিল। সুতরাং যে কোন প্রকারে তাদের একখানা টেলিভিশন চাই। অগত্যা ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে তিনি টেলিভিশন কিনতে বাধ্য হন।

কিছুদিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর জেদ্দার বন্ধু পর পর তিনদিন একাধারে তাকে স্বপ্নে দেখেন। প্রতিবারেই বন্ধুকে তিনি সীমাহীন শাস্তি ভোগ করা অবস্থায় দেখতে পান এবং প্রতিবারই রিয়াদের বন্ধু জেদ্দার বন্ধুকে অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করে বলেন যে, আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমার পরিবারের লোকদের একটু বল, তারা যেন ঘর থেকে টেলিভিশনটি বের করে ফেলে। এই টেলিভিশনের কারণেই আমার ভয়াবহ শাস্তি হচ্ছে। তারা প্রতিদিন টেলিভিশন দেখে

যত পাপ করছে তার সমপরিমান পাপ আমার আমল নামায়ও লিখা হচ্ছে। আমার কেনা টেলিভিশনে গান শুনে, অশ্লীল ছবি দেখে ওরা সুখ ভোগ করছে আর আমি তারই কারণে কঠিন আযাবে লিপ্ত আছি।

স্বপ্ন দেখে জেদ্দার বন্ধু বিমান যোগে রিয়াদে গিয়ে মৃত বন্ধুর পরিবারের লোকদের নিকট স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন। সেই সাথে তিনি এ কথাও জানিয়ে দেন যে, এরূপ স্বপ্ন আমি পর পর তিন দিন দেখেছি।

স্বপ্নের কথা শুনামাত্র পরিবারের সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ফোঁপানো কান্নার সকরুণ সুর আর বাধ ভাঙ্গা অশ্রু আঁচলে মুছে জিদ্দার বন্ধুর স্ত্রী আপন ছেলেকে লক্ষ্য করে বললো, বাবা! চেয়ে আছ কেন? শুধু কাঁদলেই তোমার আব্বার শাস্তি বন্ধ হবে না। যে অভিশপ্ত টিভির জন্য তোমার আব্বার এই করুণ দশা, সেই টিভিকে আগে ভেঙ্গে চুরমার করে দাও। আমি চাইনা এই টিভি দেখে অন্য কেহ পাপে জড়িয়ে পড়ুক।

মায়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই বড় ছেলে উঠে গিয়ে অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে টেলিভিশনটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। সাথে সাথে সকলেই খাঁটি দিলে প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা আর কোনদিন টিভি দেখবে না। এরপর জিদ্দার বন্ধু খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে পুনরায় বিমান যোগে বাসায় ফিরে আসেন।

কিছুদিন পর আবার জিদ্দার বন্ধুকে রিয়াদের বন্ধু স্বপ্নে দেখেন। এবার তিনি বন্ধুকে অফুরন্ত নেয়ামতরাজির মাঝে আনন্দ উপভোগ করা অবস্থায় দেখতে পান। তার চেহারায় তখন স্বর্গীয় দীপ্তি ঝলমল করছিল। আনন্দে আপ্লুত হয়ে রিয়াদের বন্ধু জিদ্দার বন্ধুকে মোবারকবাদ জানিয়ে বললো, আল্লাহ পাক তোমাকে বিপদাপদ থেকে মুক্ত রাখুন। তোমার উসিলায়ই আমি ভয়াবহ শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পেয়েছি।

(সূত্রঃ তামীরে হায়াত, ভারত)

প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত ঘটনা দুটি আমাদের সতর্ক হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় কি? আল্লাহর হুকুম পালনের চাইতে দুনিয়ার অবৈধ রং তামাশায় লিপ্ত হওয়ার পরিণতি কতই না ভয়াবহ! আলোচ্য ঘটনাদ্বয় তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

বস্তুতঃ টিভি, ভিসিআর, ডিস এন্টেনা যদিও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অবদান, তথাপি ব্যবহারিক জীবনে তা চরম অপদান হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। দ্বীন ঈমানের সর্বনাশ সাধনের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত শয়তান এর চাইতে বড় কোন সফল হাতিয়ার সরবরাহ করতে পারেনি। বিজ্ঞান যে শুধু আশির্বাদই নয়, অভিশাপও বটে-এটাই তার বড় প্রমাণ।

এ কথা আজ দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, সমগ্র মানবতার জন্য বিশেষ করে মুসলিম মিল্লাতের জন্য এ যুগের সবচেয়ে বড় ও ভয়ানক ফেতনা হলো, টেলিভিশন। এ আপদ যার ঘরেই প্রবেশ করেছে, তিনি দ্বীনি বা দুনিয়াবী দিক থেকে যে পর্যায়ের লোকই হোন না কেন, তার পরিবারের লোকদের মধ্যে যে বিরাট অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, তা অস্বীকার করার কোন জো নেই।

টিভি, ভিসিআর ও সিনেমার দর্শকরা নিজের অজান্তেই অনিবার্যভাবে তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তাদের স্বভাব চরিত্র ও চাল চলনে পরিবর্তন এসে যায়। এসব যন্ত্র বেশীর ভাগ খেল তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক অশ্লীলতা- বেহায়াপনা ও ইসলাম পরিপন্থী কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে তা মানব সমাজে দ্রুতগতিতে ধংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

এ তিন অবৈধ ও ধ্বংসাত্মক বিনোদন যন্ত্রের প্রথম আক্রমন হচ্ছে মানুষের লজ্জা ও আত্মমর্যাদাবোধের উপর। অর্থাৎ একজন লোক বারবার এসব বিনোদন যন্ত্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতে থাকলে তার আত্মমর্যাদা বোধ বিলুপ্ত হয়ে সে নির্লজ্জ ও বেহায়া হয়ে যায়। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, আগে প্রকাশ্যে, লোক সমাজের সামনে যে কাজটি করতে সে লজ্জাবোধ করত এখন ঐ কাজটি তাদের সামনে অবলীলাক্রমে করে যাওয়া তার জন্য কোন ব্যাপার বলেই মনে হয় না। উপরন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একথা আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, টেলিভিশন থেকে বের হওয়া আলোক রশ্মি স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর এবং কয়েকটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধির জনকও বটে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আত্মমর্যাদা বোধ নসীব করুন এবং আপন আপন বাসগৃহকে ধ্বংসাত্মক টিভি, ভিসিআর, অশ্লীল বই-পুস্তক ও পত্র পত্রিকার অভিশাপ থেকে পবিত্র রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন। ❒

কুখ্যাত ডাকাতের বিখ্যাত কাহিনী

কুর্দ নামক গোত্রের এক কুখ্যাত ডাকাত। গোত্রের নামানুসারে সারা দেশে সে কুর্দী ডাকাত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সে ছিল ডাকাত দলের সরদার। ফলে অন্যান্য ডাকাতরা তাকে শ্রদ্ধা করত। মেনে চলত।

একদিনের ঘটনা। কোন এক স্থানে ডাকাতী করতে যাওয়ার পথে সে তার দলবল সহ একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করছিল। এমন সময় সে সামনে তিনটি খেজুর গাছ দেখতে পেল। তন্মধ্যে দুটি গাছ ফলবতী ও অপর গাছটি শুষ্ক। সে লক্ষ্য করল, একটি পাখি ফলবান গাছ থেকে খেজুর নিয়ে বারবার শুষ্ক গাছে যাতায়াত করছে। এভাবে দশবার আসা যাওয়া করার পর কুর্দী ডাকাতের কৌতুহল বেড়ে গেল। প্রকৃত ঘটনা কি তা জানার জন্য তার হৃদয়মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

সে শুয়া থেকে উঠে দাঁড়াল। অতঃপর শুষ্ক গাছটিতে আরোহন করে সে দেখলো, একটি অন্ধ সাপ মুখ খুলে হা করে বসে আছে। এতে তার বুঝতে বাকী রইল না যে, এতক্ষণ পাখিটি এ সাপের মুখেই খেজুর ফেলেছে।

এ ঘটনা কুর্দী ডাকাতের মনে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করল। তার হৃদয়ে যেন এক প্রলয়ংকরী তুফান শুরু হল। সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলতে লাগলো, হে পরওয়ার দেগার! যে সাপকে মারার জন্য তোমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সাপ যখন অন্ধ হয়ে গেল তখন তাকে রিজিক পৌঁছানোর জন্য তুমি পাখি নিযুক্ত করে দিয়েছ? আর আমি তোমার বান্দা। সৃষ্টির সেরা জীব। তোমার একত্ববাদে আমি বিশ্বাস করি। তা সত্বেও তুমি আমাকে ডাকাতীর কাজে লাগিয়ে রেখেছ?

একথা মুখ দিয়ে উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে কে যেন তাকে মনের ভেতর বলে দিল, হে কুর্দী! তোমার জন্য তওবার দরজা উন্মুক্ত। ডাকাতী করে তুমি যে অপরাধ করেছ তার জন্য তুমি অনুতপ্ত হয়ে খোদার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

এ কথাগুলো মনের ভিতর ঘুরপাক খেতেই সে দু'হাত দিয়ে জোরে চাপ দিয়ে তরবারীটা ভেঙ্গে দু টুকরা করে ফেললো এবং মাথায় ধূলো নিক্ষেপ করে 'ক্ষমা' 'ক্ষমা' বলে চিৎকার করতে করতে সাথীদের নিকট চলে এলো। এমন সময় সে অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেল। কে যেন তাকে লক্ষ্য করে বলছে, হে কুর্দী! তোমার তওবা কবুল হয়েছে। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

এদিকে দলের লোকজন সরদারের এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সীমাহীন আশ্চর্য হল। তারা জিজ্ঞেস করলো, উস্তাদ! আপনার কি হয়েছে? আপনি এমন করছেন কেন?

জবাবে সে বললো, আমি এতদিন অন্ধকারে ছিলাম। আল্লাহ আমাকে আলোর পথ দেখিয়েছেন।

তারপর সে সকল ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলো। সরদারের কথাগুলো তাদের মনেও ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করলো। ফলে তারাও সঙ্গে সঙ্গে তরবারী দু'টুকরো করে বলতে লাগলো, আমরাও এতদিন বিপদগামী ছিলাম। অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিলাম। আপনার উসিলায় আমরাও সঠিক পথের সন্ধান পেলাম। আপনি যেমন অন্যায় কর্মে আমাদের সরদার ছিলেন। আপনার কথা আমরা মেনে চলতাম, ঠিক তেমনি সত্য পথে চলার ক্ষেত্রেও আপনিই আমাদের দলপতি থাকবেন। আপনার কথাই আমরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবো।

অতঃপর সকলেই লুণ্ঠিত দ্রব্য দূরে নিক্ষেপ করে পরামর্শক্রমে হজ্বের উদ্দেশ্যে এহরাম বেঁধে মক্কায় রওয়ানা হলো। এভাবে তিনদিন চলার পর তারা একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছলে জনৈক বৃদ্ধা মহিলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মাঝে কি অমুক নামের কোন কুর্দী লোক আছে? তারা বললো, হ্যাঁ, আছে। তবে তার সাথে আপনার কি প্রয়োজন? তখন বৃদ্ধা মহিলা বাড়ী থেকে বেশ কিছু কাপড় তাদের সামনে রেখে বলল, গত তিন দিন পূর্বে আমার ছেলে মারা গিয়েছে। এই তিন দিন যাবত আমি রাসূল (সাঃ)কে স্বপ্নে দেখছি। তিনি আমাকে প্রতিদিন স্বপ্নে বলছেন- তোমার ছেলের যত কাপড় চোপড় আছে তার সবই অমুক কুর্দীকে দিয়ে দিবে। এজন্য আমি সকাল থেকে

তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনাদের মাঝে তাকে খুঁজে পেয়ে সত্যিই আমি আনন্দিত। তারপর বৃদ্ধা কুর্দীর পরিচয় পেয়ে তাকে সম্বোধন করে বললো, মেহেরবাণী করে আপনার হাদিয়া কবুল করুন।

কুর্দী লোকটি বৃদ্ধা মহিলা থেকে সানন্দে কাপড়গুলো গ্রহণ করলো। এ সময় সে অস্ফুটস্বরে আল্লাহ তায়ালাকে লক্ষ্য করে বলছিল, হে কুদরতওয়ালা খোদা! তোমার পথে পা রাখার সাথে সাথে তুমি আমাদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছ। যদি আমরা পরিপূর্ণরূপে তোমার ও তোমার রাসূলের বিধান মেনে চলি তাহলে না জানি তুমি কত উত্তমভাবে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করবে।

এ ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারি যে, একজন চরম অপরাধীও যখন তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খোদার দরবারে খাঁটি দিলে তওবা করে তখন আল্লাহপাক তার তওবা কবুল করেন এবং তার অতীতের সমস্ত পাপরাশি ক্ষমা করে দিয়ে তাকে সত্যের পথে, সুন্দরের পথে পরিচালিত করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, "হে মোহাম্মদ (সাঃ) আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালূ (সূরা জুমার-৫৩) অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে আন্তরিকভাবে তওবা কর। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। (সূরা তাহরীম-৮)

এ ঘটনার দ্বিতীয় শিক্ষনীয় দিক এই যে, কেউ যখন কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালাকেই রিজিকদাতা মনে করে তখন আল্লাহ তায়ালা তার ধারণা মোতাবেক তার জন্য রিজিকের উত্তম ব্যবস্থা করে দেন। যেমনটি করেছিলেন অন্ধ সাপের জন্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে বুঝার তৌফিক দিন। আমীন। ❒

(সূত্র ঃ ফাযায়েলে ছাদাকাত)

যেভাবে বইটি সাজানো

আল্লাহর ভয়

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত উমর (রা.) এর শাসন কাল। খোদায়ী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। ইসলামের বিধি-বিধান অমান্য করে কেহই তার হাত থেকে রেহাই পেতো না। এজন্য সকলই তাকে ভয় করতো। এমনকি তিনি যে রাস্তা দিয়ে হাটতেন সে রাস্তায় শয়তান পর্যন্ত চলার সাহস পেতো না।

একদা এক ব্যক্তি রাস্তা ধরে হাটছে। হাতে তার মদের বোতল। উদ্দেশ্য মদের আসরে যোগদান করা। কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর সে দেখলো, হযরত উমর (রা.) সে রাস্তা ধরেই এদিকে আসছেন। হযরত উমর (রা.)কে দেখে তার সমস্ত দেহে কম্পন এসে গেল। মৃত্যু ভয়ে তার উষ্ণ রক্তগুলো মুহূর্তে শীতল হয়ে এলো। সে বোতল লুকানোর চেস্টা করেও ব্যর্থ হলো। ভাবলো, হযরত উমর (রা.) এর কঠোর শাস্তি থেকে আমার আর রক্ষা নেই।

হযরত উমর (রা.) যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল ততই সে মনে মনে বলছিল, হায় এখন যদি মাটি ফাঁক হতো আর আমি তাতে ঢুকে যেতে পারতাম তবুও অনেক ভাল ছিল। ইতি মধ্যে হযরত উমর (রা.) তার অনেক কাছে এসে গেলেন। তাই শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে সে আল্লাহকে স্মরণ করলো। মনে মনে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো-

হে রাহমানুর রাহীম! তুমি বড় ক্ষমাশীল। ক্ষমাকে তুমি ভালবাস। মেহেরবানী করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি আর কোন দিন তোমার নাফরমানী করবো না। তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবো না। শরাব পান করবো তো দূরের কথা কোনদিন এর ধারে কাছেও যাব না। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট খাঁটি দিলে তওবা করছি। আমার তওবা তুমি কবুল কর। হে খোদা! তুমি তো সব কিছুই পার। তোমার অসাধ্য কিছুই নেই খোদা! মেহেরবানী করে তুমি এ মদকে দুধে পরিণত করে দাও। তুমি আমাকে হযরত উমরের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। সাথে সাথে তোমার কঠোর আযাব থেকেও আমাকে হেফাজত কর।

আল্লাহ তাআলা তার দোয়াকে কবুল করলেন। বোতলের মদকে দুধে পরিনত করে দিলেন।

এদিকে হযরত উমর (রা.) তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন,

ঃ তোমার হাতে কি?

ঃ আমার হাতে একটি বোতল।

ঃ বোতলে কি আছে?

ঃ দুধ আছে।

ঃ মুখ খুলে দেখাও তো দেখি।

লোকটি বোতলের মুখ খুলে দেখালো। হযরত উমর (রা.) দেখলেন, সত্যিই তাতে দুধ আছে। সুতরাং তিনি আর কোন কথা না বলে সামনে অগ্রসর হলেন।

এদিকে লোকটি আল্লাহর কুদরত প্রত্যক্ষ করে আবারো পাক্কা এরাদা করলো যে, জীবনে আর কোনদিন সে আল্লাহর নাফরমানী করবে না। এরপর থেকে সে কখনোই ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেনি। মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (সা.) এর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে সে তার বাকী জীবন কাটিয়ে দিল।

সম্মানিত পাঠক পাঠিকা! এই ঘটনা থেকে বুঝা গেল, মানুষ যখন প্রকৃত অর্থেই আল্লাহকে ভয় করে এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন। আমরা যদি খাঁটি দিলে তওবা করি তবে তিনি আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়ে তার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন এবং জীবনের পরতে পরতে তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে সেই আল্লাহর নিকট বেশী সম্মানিত।

তাই আসুন, আমরা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহকে ভয় করি। তার অবাধ্যাচরণ করা থেকে বিরত থাকি। রাসুল (সা.) এর সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সবাইকে তাওফীক দাও। আমীন॥ ❐

মেহমানদারীর সুফল

হযরত আবু রাবী (রাহঃ) বলেন, কোন এক গ্রামে একজন নেককার মহিলা ছিল। তার সুনাম-সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার নাম ছিল ফিদ্দাহ। কোন মেয়ের সাথে সাক্ষাত করা আমার স্বভাব বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও আমি তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। মেয়েটি যে গ্রামে বাস করে সে গ্রামে গিয়ে শুনতে পেলাম যে, মেয়েটির একটি বকরী আছে। যার এক স্তন দিয়ে দুধ এবং অপর স্তন দিয়ে মধু বের হয়। একথা শুনে আমি অত্যন্ত অবাক হলাম এবং একটি নতুন পেয়ালা খরিদ করে তার বাড়ীতে গিয়ে বললাম, তোমার ও তোমার বকরীর অনেক নাম-ডাক শুনেছি। এখন এর বরকত স্বচক্ষে দেখার জন্য তোমার বাড়ীতে চলে এসেছি। একথা শুনার পর মেয়েটি সাথে সাথে তার বকরীটি আমার হাতে সোপর্দ করে বললো, আপনি নিজেই এর বরকত পরীক্ষা করে দেখুন।

আমি নিজ হাতে দোহানোর পর বাস্তবিকই দেখতে পেলাম যে, উহার এক স্তন হতে দুধ এবং অন্য স্তন হতে মধু বের হল। আমি দুধ ও মধু তৃপ্তি সহকারে পান করলাম। তারপর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা বোন! তুমি কিভাবে কোত্থেকে এ বরকতময় বকরী লাভ করেছ? মেয়েটি বললো, আন্তরিকভাবে মেহমানদারীর বরকতেই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ বকরী দান করেছেন। তারপর মেয়েটি সম্পূর্ণ ঘটনা আমাকে এভাবে শুনাল–

আমরা গরীব মানুষ। একটি বকরীই ছিল আমাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। উহা দ্বারাই কোনমতে আমাদের সংসার চলতো। একবার কুরবানীর ঈদ নিকটবর্তী হলে আমার স্বামী বললেন, ফিদ্দাহ! আমাদের যখন আর কোন সম্বল নেই, চল এ বকরীটি দ্বারাই আমরা কুরবানী করি। আমি বললাম, আমাদের উপর যখন কুরবানী ওয়াজিব নয় তখন জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় হিসেবে এ বকরীটি কুরবানী করা বোধ হয় ঠিক হবে না। স্বামী আমার কথা মেনে নিলেন।

যেভাবে বইটি সাজানো

কুরবানীর ঈদ চলে যাওয়ার বেশ কয়েকদিন পর আমাদের বাড়ীতে মেহমান আসল। তখন আমি স্বামীকে বললাম, হাদীস শরীফে তো মেহমানদারীর অনেক ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আর আমাদের যেহেতু এই বকরীটি ছাড়া মেহমানদারী করার মতো অন্য কিছু নেই সেহেতু এটিকেই জবাই করে নিন। মেহমানদারীর বরকতে আল্লাহ তায়ালা হয়তো আমাদের চলার জন্য উত্তম কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

আমার প্রস্তাবটি স্বামী আনন্দচিত্তে গ্রহণ করার পর আমি তাকে একথাও বলে দিলাম যে, ছেলে মেয়েরা দেখলে হয়তো কান্নাকাটি করতে পারে। তাই উহাকে দেয়ালের আড়ালে নিয়ে জবাই করলে ভাল হয়। পরামর্শমত স্বামী যখন বকরীর গলায় ছুরি চালাচ্ছিল তখন হঠাৎ দেখলাম এ বকরীটি দেয়ালের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আমি ভাবলাম, বকরীটি হয়তো স্বামীর হাত থেকে ছুটে এখানে চলে এসেছে। কিন্তু বাইরে গিয়ে দেখি তিনি বকরীর চামড়া উঠাচ্ছেন। আমি বড় আশ্চর্য হয়ে স্বামীকে বললাম, এই বকরীটির মত আরেকটি বকরী আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে। উভয় বকরীর মধ্যে বিন্দুমাত্রও কোন তফাৎ নেই। স্বামী বললেন, হয়তো আল্লাহ পাক প্রতিদান স্বরূপ উহা আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই হল সেই বকরী যে দুধ ও মধু উভয়টি দান করে। (সূত্র ঃ ফাযায়েলে ছাদাকাত)

মুহতারাম পাঠক! এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাও কি সন্তুষ্ট চিত্তে আন্তরিকভাবে মেহমানের মেহমানদারী করার জন্য সচেষ্ট হতে পারি না? আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে সে যেন মেহমানের মেহমানদারী করে। ❑

ধৈর্যের পাহাড়

আবুল হাসান সিরাজ (রাঃ)। একজন প্রখ্যাত বুযুর্গ। একদা তিনি হজ্বের মৌসুমে তাওয়াফ করছিলেন। এমন সময় অনিচ্ছাবশতঃ হঠাৎ একটি মেয়ের উপর তার নযর পড়ে যায়। সাথে সাথে তিনি দৃষ্টি সংযত করেন এবং বলেন, খোদার কসম এমন উজ্বল চমকপ্রদ চেহারা আমি জীবনে কখনও দেখিনি। মনে হয়, মেয়েটি জীবনে কোনদিন দুঃখ পায়নি-তাই তার চেহারায় এত রূপ লাবণ্য।

এ কথাগুলো আনমনে একটু আওয়াজ করেই বলে ফেলেছিলেন তিনি। ফলে মেয়েটি তাঁর কথাগুলো শুনে ফেলে। সে আবুল হাসান সিরাজ (রাহঃ)কে সম্বোধন করে বললো, আপনি কি ভাবছেন, আমি জীবনে কোনদিন দুঃখ কষ্ট পাইনি? কখনো বিপদ আপদের সম্মুখীন হইনি? বুযুর্গ বললো, হ্যাঁ আমি তো তাই ভাবছি। কেননা কষ্ট-ক্লেশ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কোন মানুষের চেহারা এত সুন্দর থাকতে পারে না। যারা সর্বদা এটা-সেটা না থাকার, না পাওয়ার বেদনায় অস্থির থাকে, যাদের হৃদয়-মন সর্বদাই থাকে বিষণ্নতায় ভরপুর তাদের মুখশ্রী ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় এত উজ্বল দেখা যায় না।

মেয়েটি বললো, চেহারার রূপ-লাবণ্য অবশিষ্ট থাকার জন্য আপনি যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা হয়ত ঠিক। তবে আপনি আমার ব্যাপারে যে ধারণা করেছেন তা কিন্তু মোটেও ঠিক নয়। কেননা জীবনের এই স্বল্প পরিসরে আমি যে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়েছি, অন্য কোন মানুষের জীবনে এরূপ দুঃখ-মছীবত এসেছে কি-না তা আমার জানা নেই। যদি সেই মছীবত পাহাড়ের উপর পতিত হত তবে উহাও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। কিন্তু এত দুঃখ-কষ্টের পরেও আমি সবর করেছি। ধৈর্য্যধারণ করেছি। আমি এগুলোকে খোদার পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা মনে করে মেনে নিয়েছি। পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় চোখের পানি সংযত করেছি। আর প্রতিটি বিপদের পর আমি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করেছি।

আমি পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে ধৈর্য ধারণ করেছি, যে আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "আমি তোমাদেরকে অবশ্যই ভয়, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষতি ও ফসলাদি বিনষ্টকরণের মাধ্যমে পরীক্ষা করব। হে মোহাম্মদ (সাঃ)! আপনি (এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) ধৈর্যশীলদেরকে (মহা পুরস্কারের) সু-সংবাদ শুনিয়ে দিন, যারা বিপদে পতিত হয়ে বলে, "আমরা তো আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমাদের সবাইকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তারা তো ঐ সমস্ত লোক যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত। (বাকারা-১৫৬-১৫৭)

জনাব! এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করেই আমি এসব দুঃখ কষ্টকে সহাস্য বদনে বরণ করে নিয়েছি, ধৈর্যের পাহাড় হয়ে এগুলোকে হজম করে নিয়েছি। একের পর এক বিপদ আসার পরও আমি ভেঙ্গে পড়িনি। তাই এর কোন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আমার দেহে কিংবা চেহারায় ফুটে উঠেনি। বরং দিন দিন আমার চেহারার রূপ-সৌন্দর্য্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্বাস্থ্য পূর্বের চেয়ে আরও ভাল হচ্ছে। আমার বক্তব্য থেকে আশা করি আপনি রূপ-লাবণ্যের মূল কারণটি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন।

বুযুর্গ বললেন, হ্যাঁ। তবে তোমার অতীত জীবনের দুঃখের কাহিনীগুলো আমাকে শুনাবে কি? মেয়েটি বললো, আপনি যখন শুনতে চাচ্ছেন তাহলে শুনুন। এ বলে সে তার দুঃখের কাহিনী শুরু করলো—

তখন ছিল ঈদুল আযহার মৌসুম। কুরবানী উপলক্ষে আমার স্বামী বাজার থেকে একটি বকরী ক্রয় করে এনেছিলেন। বকরীটি দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি হৃষ্টপুষ্ট ছিল। আমার ছেলে শামীম ও ফাহিম বকরীটিকে খুব আদর করত। লতা-পাতা এনে খেতে দিত। এভাবে অল্প ক'দিনের মধ্যেই বকরীটির সাথে তাদের এক বিরাট সখ্যতা গড়ে উঠেছিল।

শামীম ছিল ফাহিমের দু'বছরের বড়। শামীমের বয়স ৮ বছর আর ফাহিমের বয়স ৬ বছর। এ দু'জন ছাড়াও নাঈম ও নাঈমা নামের আমার দুটি ছেলে মেয়ে ছিল। নাঈমের বয়স দেড় বছর আর

নাঈমা ছিল সকলের বড়। ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে একজন দীনদার আলেমের কাছে তাকে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমার সবগুলো ছেলে-মেয়েই সুন্দর ছিল। তবে নাঈমার সৌন্দর্য্যের পরিমানটা তুলনামূলকভাবে তাদের চেয়ে একটু বেশী ছিল।

যাহোক ঈদের দিন নামাজ থেকে এসে আমার স্বামী বকরী জবাই করলেন। জবাইয়ের সময় শামীম ও ফাহিম পাশেই দাঁড়ানো ছিল। প্রিয়তম বকরীটিকে জবাই করার কারণে তারা মনে খুব দুঃখ পেয়েছিল। অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল তাদের নয়নগুলো।

জবাই ও গোস্ত বানানোর যাবতীয় কাজ শেষ করে শামীমের আব্বা আমাকে বললেন, তুমি গোস্ত পাকাতে থাক। আমি এক জায়গায় যাচ্ছি। আসতে হয়তো বিকাল হয়ে যাবে। আমি বললাম, ঠিক আছে। যান। আল্লাহ আপনার হেফাযত করুন।

স্বামী চলে যাওয়ার পর আমি ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে রান্না করতে বসলাম। আর শামীম ও ফাহিম বাড়ীর অদূরে একটি মাঠে খেলাধূলায় লিপ্ত হয়ে গেল। খেলার এক পর্যায়ে শামীম ফাহিমকে বললো, আব্বা কিভাবে বকরী জবাই করেছিলেন তা কি তোমাকে দেখাবো? জবাবে ফাহিম বললো, হ্যাঁ দেখাও।

সম্মতি পেয়ে শামীম ফাহিমকে শোয়াল এবং পাশের ঘর থেকে একটি ধারাল ছুরি এনে তাকে জবাই করে ফেললো। এবার ফাহিমের রক্ত দেখে শামীম ঘাবড়ে গেল। সে ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে আত্মরক্ষার জন্য দৌঁড়ে গিয়ে পাহাড়ে চড়ল। কিন্তু হায়! ভয়ে সে পাহাড়ে চড়েছিল ঠিকই কিন্তু সেখানেও সে বাঁচতে পারলো না। নিকটবর্তী জঙ্গলের হিংস্র বাঘের আক্রমণে তার জীবন প্রদীপ সেখানেই নিভে গেল।

একটু পরে ঘর থেকে বের হয়ে মাঠের মধ্যে আমি ফাহিমের জবাইকৃত লাশ দেখতে পেলাম। সাথে সাথে ইন্না লিল্লাহ .... পড়ে শামীমের খুঁজ করতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না। বিকেলে শামীমের আব্বা বাড়ীতে এলে তাঁর নিকট সবকিছু বর্ণনা করলাম। সব শুনে তিনি আমাকে ধৈর্য্য ধরার আহবান জানিয়ে শামীমের খুঁজে বের হয়ে গেলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস!

তিনিও আর ফিরতে পারলেন না। পাহাড়ে-জঙ্গলে-ময়দানে সর্বত্র ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় পানির প্রচন্ড পিপাসায় তিনিও আমাদেরকে ছেড়ে চিরকালের জন্য পরপারে চলে গেলেন।

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন আমার স্বামী বাড়ীতে ফিরে এলেন না তখন আমার মনে ক্রমান্বয়ে ভয় ও আশংকা দানা বাঁধতে লাগলো। এভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর এক পর্যায়ে আমি কোলের বাচ্চাটিকে ঘরে বসিয়ে বাড়ীর এক প্রান্তে চলে গেলাম এবং শামীমের আববা তাকে নিয়ে ফিরে আসছে কি-না তা দেখতে লাগলাম। এভাবে দেখতে দেখতে বেশ সময় চলে গেল। তাদের চিন্তায় আমি এত বেশী মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম যে, কোলের বাচ্চা নাঈমের কথা একদম ভুলে গেছি। অতঃপর স্মরণ হওয়া মাত্র আমি দ্রুতপদে ঘরে ফিরি। কিন্তু এরই মধ্যে যা ঘটার ঘটে গিয়েছিল।

আমি কিছুক্ষণ পূর্বে চুলার উপর বড় ডেকচীতে গোশ্ত বসিয়ে ছিলাম। তরকারীর ঝুলগুলো তখন টগবগ করে ফুটছিল। আমি বাইরে চলে যাওয়ার পর নাঈম হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে যায় এবং ডেকচীতে রাখা গোশ্তের হাড্ডি ধরে টান দিতেই সমস্ত ডেগ কাত হয়ে তার উপর পড়ে যায়। এতে তার সমস্ত দেহ পুড়ে গিয়ে শরীরের মাংস খসে পড়ে। সাথে সাথে সেও দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

পরদিন সকালে পিতা ও তিন ভাইয়ের নিহত হওয়ার সংবাদ যখন নাঈমার কাছে পৌঁছল তখন সেও সাথে সাথে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তারও প্রাণ বায়ু উড়ে গেল। চলে গেল এমন এক জগতে যেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসে না।

এভাবে এক এক করে সবাইকে হারিয়ে আমি একাই রয়ে গেছি। সবুজ শ্যামল এ ধরণীতে পাহাড়সম ধৈর্য নিয়ে একাই বেঁচে আছি। দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে ধৈর্যধারণ করার তৌফিক নসীব করেন। (সূত্র ঃ ফাযায়েলে হজ্ব)

সমাপ্ত

পাঠকের মতামত

.... আমি একজন গৃহিণী। বই পড়া আমার নেশা। জীবনে অনেক বই পড়েছি আমি। যে কয়টা বই আমার নিকট সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছে সেগুলোর মধ্যে আপনার যে গল্পে হৃদয় গলে '১ম ও ২য় খন্ড' এক নম্বরে স্থান পাওয়ার যোগ্য। বইয়ের প্রতিটি ঘটনাই আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। বইটির নামের সাথে বিষয়বস্তুর এত সুন্দর মিল জীবনে খুব কমই দেখেছি। বইখানা পড়ে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। আশা করি এর আরো কয়েকটি খন্ড বের করে পাঠক সমাজকে আরও বেশী পরিমানে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিবেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ❑

-ফৌজিয়া ইয়াসমীন, ভাটপাড়া, পলাশ, নরসিংদী।

.... আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কারণ আপনি আমাদেরকে আপনার বইয়ের গঠনমূলক সমালোচনা করার অধিকার প্রদান করেছেন। এর মাধ্যমে মূলত আপনি আকাবিরে দেওবন্দের নীতিকেই অনুসরণ করেছেন। যা দৃঢ় ইখলাছ, প্রশস্ত মন ও পাঠকদের আশা আকাংখা ও মন মানসিকতাকে গুরুত্ব দেয়ারই প্রমাণ বহন করে। আমার মতে, বইটির বিষয়বস্তু যুগোপযোগী ও আকর্ষনীয়। ভাষা ও উপস্থাপনা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, সূর্যের পরিচয় সূর্য নিজেই। বৃক্ষের পরিচয় তার ফলে। গোলাপ ফুলের মূল্যায়ন তার সৌরভে ও সুঘ্রাণে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার তো মনে হয়, বর্তমান কালের বই পাগল দ্বীনদার লোকেরা যেন এ জাতীয় গ্রন্থের আত্মপ্রকাশের জন্যই যুগযুগ ধরে অপেক্ষা করে আসছিল। সম্মানিত লেখকের নিকট বিনীত আরজ, তিনি যেন তার এ সাধনা অব্যাহত রাখেন। আমি গ্রন্থখানার বহুল প্রচার কামনা করি। ❑

-মোঃ শফীকুল ইসলাম। কর অঞ্চল-৪, ঢাকা।

যে গল্পে হৃদয় গলে, সত্যিই একখানা উপদেশমূলক বই। শিক্ষা গ্রহণের অনেক কিছুই এতে রয়েছে। এর উভয় খন্ড পাঠ করে আমি কত যে আনন্দিত হয়েছি এবং কি পরিমাণ উপকৃত হয়েছি তা আপনাকে ভাষায় বুঝাতে পারবো না। অন্যান্য মহিলারাও আমার বাসায় এসে এ বইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমার বিশ্বাস, যদি কেউ আমলের নিয়তে মনোযোগ সহকারে বইখানা পাঠ করে, তবে তার জীবনে আমূল পরিবর্তন আসবেই। এর আরও কয়েকটি খন্ড বের করার অনুরোধ রইল। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আমীন। ❑

-উম্মে তালহা, পাহাড়পুর, পান্তি বাজার, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

.... জানিনা সুদুর গ্রামের এই নগন্য বালিকার দু'কলম লেখা আদৌ আপনার হাতে পৌঁছবে কিনা। ....আমি একজন ছাত্রী। লেখাপড়া নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি আমি। এরই মাঝে আপনার বইখানার হৃদয়কাড়া প্রচ্ছদ ও সুন্দর নাম আমাকে দারুণভাবে আর্কষণ করে। হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করি বইখানা। কিছুক্ষণ পড়ার পর আমার নয়নগুলো অশ্রুসজল হয়ে পড়ে। আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই আমি। মনে হল, এত সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী গল্পের বই জীবনেও পড়িনি। কয়েকদিন পর আমার এক বান্ধবীকে বইখানা পড়তে দেই। সে আগে পর্দা করত না। এ বইটি পড়ে সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আর কোনদিন বেপর্দা অবস্থায় চলবে না। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। ❑

-নাজমা আখতার, আঁখিতারা, বি-বাড়ীয়া

.... সারা দেশ আজ কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। বিভিন্ন কলা কৌশলে চলছে মুসলমানদের ঈমান আকীদা ধ্বংস করার বহুমুখী পরিকল্পনা। তম্মধ্যে একটি শক্তিশালী কৌশল হল, অশ্লীল বইপুস্তক ও পত্র-পত্রিকা। যা পাঠ করে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে সুস্থ ধারার সাহিত্য চর্চা করে সুখপাঠ্য বই রচনা করা যুগের অন্যতম চাহিদা ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে গল্পে হৃদয় গলে রচনা করে লিখক সে চাহিদাই অনেকাংশে পুরা করেছেন। পড়ার সময় মনে হয়েছে, বইটির নামকরণ সম্পূর্ণরূপে স্বার্থক হয়েছে। বইয়ের প্রচ্ছদ, ভাষা, উপস্থাপনা সবই আমাকে দারুণভাবে পুলকিত করেছে। .... সম্ভব হলে এর আরও কয়েকটি খন্ড বের করলে ভাল হয়। ❑

-মোঃ মতিউর রহমান, জগদাশ বাজার, মাগুরা, যশোর।

আমরা একই ক্লাসের কয়েকজন ছাত্রী। আপনার বইখানার উভয় খন্ড আমাদের অসম্ভব ভাল লেগেছে। ঘটনার সাথে উল্লেখ করা আপনার প্রাসঙ্গিক আলোচনাগুলো, শিক্ষনীয় দিকগুলোকে হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে দিতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের মতে সর্বস্তরের লোকদের এ বইগুলো পাঠ করা উচিত। আপনার ২য় খন্ডের ২য় সংস্করণে তৃতীয় খন্ড বের হওয়ার কথা শুনে যারপর নাই আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বিনীত অনুরোধ, তৃতীয় খন্ড পর্যন্ত পৌঁছেই থেমে যাবেন না। বরং আরও কমপক্ষে ৫/৭টি খন্ড বের করুন। এতে মুসলিম সমাজের অনেক উপকার হবে। ❑

-শিরিন, হাফসা, হাবীবা, নরসিংদী।

লেখকরা বই লিখেন আর পাঠকরা তা পাঠ করেন। যদি বইটি ভাল হয়, সুন্দর হয়, আকর্ষণীয় হয়, তাহলে পাঠকরা যেমন খুশি হন, আনন্দিত হন, ঠিক তেমনি বিভিন্ন প্রকার কথার মাধ্যমে ভাল লাগার অনুভূতিটুকু নির্দ্বিধায় তারা বন্ধু-বান্ধব ও অন্যদের কাছে প্রকাশও করেন। আবার কখনো কখনো লেখককে উদ্দেশ্য করে শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি-পত্রও প্রেরণ করেন। এভাবেই গড়ে উঠে লেখক আর পাঠকের মাঝে এক গভীর আত্মার সম্পর্ক। যে গল্পে হৃদয় গলে তেমনি একখানা বই। যার লেখক খুব অল্প দিনের মধ্যেই পাঠকের হৃদয় জয় করে তাদের সাথে এক হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। .... বইটি পাঠ করার সময় আমার মনে হয়েছিল, শত সহস্র বার অভিনন্দন জানালেও লেখকের হক আদায় হবে না। কেননা সঠিক দৃষ্টিকোন থেকে এত সুন্দর, মূল্যবান ও উপদেশমূলক বই আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি। আমার মতে, সর্বস্তরের জনগণের জন্য এটি একটি সুখপাঠ্য বই। আল্লাহ পাক লেখককে জাযায়ে খায়ের দান করুন। ❑

-মাওঃ নুরুল কবীর, প্রিন্সিপাল, তালীমুল কুরআন
হাফেজিয়া মাদরাসা, রাঙ্গামাটি, নরসিংদী।

মুসলিম জাতির এ ক্রান্তি লগ্নে দ্বীন ঈমানের হেফাজতের খাতিরে উদীয়মান সাহসী কলম সৈনিক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম সাহেবের লিখিত যে গল্পে হৃদয় গলে ১ম ও ২য় খন্ড অধ্যয়ন করে উপলব্দি করেছি যে, বর্তমানে অখাদ্য কুখাদ্য দ্বারা বাজার সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। যা পাঠ করে লোকজন বিশেষ করে যুবক যুবতীরা ঈমান হারা হচ্ছে। এ কুখাদ্যের পরিবর্তে লেখক যে তাদের সামনে সুখাদ্য পরিবেশন করেছেন সত্যি তা প্রশংসার দাবী রাখে। আল্লাহ তাআলা লেখককে দীর্ঘ হায়াত দান করুন এবং এ প্রয়াসকে কবুল করতঃ তার এ মেহনতকে অব্যাহত রাখার তাওফীক দিন। আমীন।❑

-মুফতি মোঃ শফীউল্লাহ গোপালপুর, টাঙ্গাইল।

........আপনার বইখানা সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছে। একটি ঘটনা শেষ হতে না হতেই আরেকটি ঘটনা পড়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। প্রথম খন্ডের পর ২য় খন্ডও বের হয়েছে শুনে সীমাহীন খুশি হই। সাথে সাথে বই খানা সংগ্রহ করে পড়ে শেষ করে ফেলি। প্রথম খন্ড থেকে ২য়

খন্ডটি আমার নিকট আরও ভাল লেগেছে। একদিন ২য় খন্ড থেকে তালীমের মহিলাদেরকে একটি ঘটনা পড়ে শুনালে তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বলতে থাকে, আমরা আর কোনদিন আব্বা আম্মাকে কষ্ট দিব না..........। দোয়া করি আল্লাহ পাক আপনাকে এ জাতীয় গ্রন্থ আরো কয়েকটি রচনা করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ❑

-মাসউদা আখতার, ভাগদী, নরসিংদী।

.... আমি একজন বার তের বছরের বালক। ভারত বাংলাদেশ মিলিয়ে ৬ বছর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনা করেছি আমি। বর্তমানে আমি মাদরাসায় পড়ি। জীবনের এই ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলা ইংরেজী অনেক গল্পের বই পড়েছি আমি। কিন্তু আপনার বইখানা আমাকে যতটা আনন্দ দিয়েছে এবং সৎপথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছে অন্য কোন বই তা পারেনি। প্রতিটি গল্পের শুরু এবং শেষ আমাকে দারুনভাবে প্রভাবিত করেছে। আশা করি আপনি এ জাতীয় গল্পের বই আরও লিখবেন। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার সমবয়সী ভাই-বোনদেরকে এই বইখানা পড়ার এবং সেই অনুপাতে আমল করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। ❑

-শামীম হোসাইন, ভাওড়া, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

বিশ্বের মুসলমানগণ আজ চরম সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন। আমার মতে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলামী আদর্শ থেকে মুসলমানদের দূরে সরে থাকাই এর মূল কারণ। লেখক মুলত গল্পচ্ছলে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদের জীবনে ইসলামী আদর্শগুলোকে পুনর্জীবিত করারই আপ্রাণ চেস্টা করেছেন। যা একটি মহৎ উদ্যোগও বটে। আমি লেখকের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আল্লাহ তাঁকে এবং তার বইকে কবুল করুন। আমীন। ❑

-মোঃ নূরুল ইসলাম, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

যেভাবে বইটি সাজানো

একটি ঘোষণা

আগামী খন্ডগুলোতেও পাঠকের মতামত বিভাগ চালু থাকবে। যে গল্পে হৃদয় গলে পড়ে আপনার কেমন লাগলো, তা জানিয়ে আজই লেখক বরাবর চিঠি লিখার অনুরোধ রইল। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী প্রতিটি খন্ডে কিছু কিছু করে ছাপা হবে।

যেখান থেকে বইটি সংগ্রহ করবেন

(১) আল-কাউসার প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা। (২) দারুল উলূম লাইব্রেরী, বিশাল বুক কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা। (৩) আল আশরাফ প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা (৪) থানভী লাইব্রেরী, মাদরাসা রোড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। (৫) এমদাদিয়া বুক হাউস, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা। (৬) থানভী লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। (৭) মাক্কি মাদরাসা, কিল্লার মোড়, লালবাগ, ঢাকা। (৮) মোস্তফা লাইব্রেরী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। (৯) আল মানার লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। (১০) মোহাম্মদী কুতুবখানা, বন্দরবাজার, সিলেট। (১১) নিউ মাদানিয়া লাইব্রেরী, কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট। (১২) আজিজিয়া লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, মৌলভী বাজার। (১৩) শাহীন লাইব্রেরী, মসজিদ রোড, বি, বাড়ীয়া। (১৪) শামসুল উলূম লাইব্রেরী, স্টেশন রোড, নরসিংদী। (১৫) এমদাদিয়া স্টোর, স্টেশন রোড, নরসিংদী। (১৬) থানভী লাইব্রেরী, লাইব্রেরী পট্টি, নরসিংদী। (১৭) দারুল কিতাব, যশোর। (১৮) তাজ লাইব্রেরী, মসজিদ রোড বি-বাড়ীয়া। (১৯) এদারায়ে কুরআন, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা। (২০) সোলামানিয়া লাইব্রেরী, মসজিদ রোড, বি-বাড়ীয়া।

এছাড়া গ্রন্থমেলা ও দেশের অভিজাত লাইব্রেরী সমূহে বইটি খুঁজ করুন।

তাদের জন্য এই আয়োজন

◆ যারা চরিত্রগঠনমূলক হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী গল্প-কাহিনী পড়তে ভালবাসেন।

◆ যারা বিভিন্ন প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় মানবীয় গুণাবলী অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ অর্জন করতে চান।

◆ যারা স্বীয় সন্তান কিংবা অন্য কোন আপনজনকে নেককার, খোদাভীরু, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য কোন ভাল বই খোঁজ করছেন।

◆ যারা প্রিয়জনকে এমন কোন অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিতে চান যা উপহার গ্রহীতাকে কেবল খুশিই করবে না, হৃদয়ের খোরাকও যোগাবে।

◆ যারা ঈমানের মজবুতী ও নিস্তেজ হয়ে পড়া জেহাদী চেতনাকে শাণিত করতে চান।

◆ যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদানের জন্য সন্তোষজনক কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

◆ যারা নিজেদের পাঠাগারগুলোকে নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠমানের বই দ্বারা সমৃদ্ধ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

◆ যারা নিজেদের ভাষণ-বক্তৃতাগুলোকে আরও তেজোদীপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার মাধ্যমে মুসলমান নর-নারীদের জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন।

বইটি নিজে পড়ুন। সংগ্রহে রাখুন।
ভাল লাগলে অপরকেও পড়তে
এবং সংগ্রহে রাখতে উৎসাহিত করুন।

প্রকাশক
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০